প্রকাশক :
ব্রজকিশোর মণ্ডল
বিশ্ববাণী প্রকাশনী
৭৯/১ বি মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ
২ আগস্ট ১৯৬০

প্রচ্ছদ :
মদন সরকার

প্রুফ সংশোধন :
রবি বসু

মুদ্রাকর :
গোপাল ঘোষ
শ্রীকৃষ্ণ প্রেস
৬ শিবু বিশ্বাস লেন
কলিকাতা-৬

আট টাকা

গ্রাম বাংলার পথে পথে

গ্রাম বাংলার পথে পথে

গ্রাম বাংলার পথে পথে

গ্রাম বাংলার পথে পথে

গ্রাম বাংলার পথে পথে

গ্রাম বাংলার পথে পথে

গ্রাম বাংলার পথে পথে

গ্রাম বাংলার পথে পথে

রংপুরের আধিয়ার চাষী

□ □ □ □ □ □

বর্গা প্রথা কোথায় নেই? আমাদের পূর্ব-পাকিস্তানের সমস্ত জেলাতেই বর্গা প্রথা প্রচলিত আছে। কিন্তু রংপুর আর দিনাজপুর— এই প্রদেশের এই দুটি জেলায় এই প্রথা এমন বর্বর ও অমানুষিক রূপ ধারণ করেছিল, যার নজির আর কোথাও মিলবে না। মাথার উপর অল্পসংখ্যক জোতদার, আর তাদের পায়ের তলায় লক্ষ লক্ষ সর্বহারা আধিয়ার চাষী, সমাজদেহের এই ছিল গঠন। জোতদারদের পায়ের তলায় থেকে এই আধিয়ার চাষীদের জীবন কাটত। আর তাদের পায়ের চাপে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে ধুলো ধুলো হয়ে মিশে যেত তাদের মনুষ্যত্ব, তাদের বর্তমান ভবিষ্যৎ আর তাদের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রেম প্রীতি ভালবাসা। শত শত বছর ধরে এই নির্মম শোষণ ও শাসন চলে আসছিল। যাদের মানুষ বলে, এরা তাদের পর্যায়ে পড়ত না। আর জোতদাররা? না, তারাও না।

বৃটিশ শাসনের আমলে ইংরাজী শিক্ষার প্রসারের মধ্য দিয়ে পশ্চিম জগত থেকে যে নতুন ভাবপ্লাবন বয়ে এসেছিল, তার ফলে বাংলাদেশের মরা গঙ্গায় বান জেগে উঠল। কিন্তু এখানকার

সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার দৃঢ় প্রাচীরের গায়ে প্রতিহত সেই প্লাবন ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেল। বিদেশী শাসকদের প্রয়োজনে, ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক, একান্তভাবে কৃষিনির্ভর আমাদের এই দেশের এখানে-ওখানে শিল্পসৃষ্টি সম্ভাবনার কিছু কিছু লক্ষণ ফুটে উঠছিল, কিন্তু উত্তরবঙ্গের এই অঞ্চলগুলি সেই সম্ভাবনা থেকে বঞ্চিত হয়ে রইল। তার ফলে এখানকার আধিয়ার চাষী, এমন কি বিত্তশালী জোতদাররা পর্যন্ত প্রাচীন দিনের সনাতন জীবন-ব্যবস্থার জাবর কেটে চলল।

বাংলা দেশের লোকসাধারণের জীবনযাত্রার ইতিহাস নিয়ে যাঁরা চর্চা করছেন, এই অন্ধকার অঞ্চলগুলি তাঁদের দৃষ্টির বাইরেই থেকে গেছে। মাটি খুঁড়ে প্রাচীন দিনের সমাজ-জীবনের নিদর্শন খুঁজে বার করবার জন্য কিছু কিছু চেষ্টা চলে আসছে, কিন্তু অতীত সমাজের এই জীবন্ত ফসিলগুলি অবহেলিত ও অজ্ঞাত হয়ে পড়ে রইল।

দেশের স্বাধীনতার জন্য যাঁরা একদিন মুক্তি সংগ্রাম পরিচালনা করেছিলেন, এই সমস্ত হতভাগ্য আধিয়ার চাষীদের দুঃখ লাঞ্ছনা তাঁদের মনে কোন দাগ কাটতে পারেনি। দেশের নেতারা যে সমস্ত দাবি-দাওয়ার ফিরিস্তি দিতেন, এখানকার এই চিরবঞ্চিত নিঃস্ব মানুষগুলির বাঁচার দাবি তাদের মধ্যে স্থান পেত না। স্বাধীনতা লাভের পর দীর্ঘ সতেরো বছর কেটে গেল, আজও আমাদের দেশের সরকার, দেশের নেতা বা দেশের মানুষ এই সমস্ত হতভাগ্য আধিয়ার চাষীদের কথা নিয়ে মাথা ঘামায় না। একথা সত্য, অতি বড় নির্মম সত্য।

রংপুর জেলার উত্তরাংশে নীলফামারী মহকুমা। তারপরেই বর্ডার। বর্ডারের ওপারে জলপাইগুড়ি জেলা। আজ পরদেশের

অংশ হলেও দেশবিভাগের আগ পর্যন্ত রংপুরের উত্তরাঞ্চলের লোকদের কাছে জলপাইগুড়ি বিদেশ ছিল না। রংপুরের দক্ষিণাঞ্চল থেকেও জলপাইগুড়ি ছিল তাদের কাছে অনেক বেশী আপন। কথাবার্তা, চালচলন, রীতিনীতি, কাজ-কারবার, লেনদেন, বিয়ে-থাওয়া—সকল ব্যাপারেই। এ-পারের লোক ওপারে গিয়ে হাটবাজার করত। জলপাইগুড়িতে খুব বড় বড় মেলা বসত। উত্তরের ভুটান থেকে ব্যবসায়ীরা ঘোড়া, কুকুর, কম্বল, কমলালেবু ইত্যাদি পণ্যদ্রব্য নিয়ে সেই সব মেলায় আসত। এ-পারের লোকেরা কেনাবেচা করার জন্য দলে দলে সেই মেলায় যোগ দিত। এপার আর ওপারের মধ্যে সবচেয়ে বড় মিল যেটা তা হচ্ছে এই যে, এই দুই অঞ্চলের চাষীরাই একই নির্মম জোতদারী ব্যবস্থার চাপে সীমাহীন দুর্দশা ভোগ করে আসছিল।

নীলফামারী মহকুমার তিনটি থানা ডিমলা, ডোমার আর জলঢাকা জোতদারদের অবাধ শোষণ ও লুণ্ঠনের লীলাভূমি। রংপুরের সর্বত্র জোতদারী শোষণ ব্যবস্থা প্রচলিত থাকলেও এই অঞ্চলের সঙ্গে আর কোন অঞ্চলের তুলনা হয় না। এখানকার মত বড় বড় জোতদার আর কোথাও ছিল না। জোতদারদের এক-একজন হাজার হাজার বিঘা জমির মালিক, অপরদিকে চাষীরা নিঃস্ব, সর্বহারা। যে কোন ব্যাপারেই হোক না কেন, চাষীকে একান্তভাবে জোতদারের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করে থাকতে হয়। জোতদার তার খুশীমত যে কোন সময় বিনা অজুহাতে এক বর্গাদারের হাত থেকে জমি কেড়ে নিয়ে অন্য বর্গাদারের কাছে লাগায়। সেইজন্য বর্গাদারকে জোতদারের যে কোন জুলুম অবোলা প্রাণীর মত মুখ বুজে সহ্য করে নিতে হয়।

জোতদারদের মধ্যে হিন্দু (বর্মণ) ও মুসলমান এই দুই

সম্প্রদায়ের লোকেরাই আছে। কিন্তু ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক হলেও এদের পরস্পরের মধ্যে সামাজিক সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। একে অপরের ঘরে স্বচ্ছন্দে যাতায়াত করে, মন খুলে মেলামেশা করে। এরা এত বেশী শ্রেণী-সচেতন যে সাম্প্রদায়িক বিরোধের ঘনঘটার মাঝখানেও এরা একে অপরের উপর বিশ্বাস হারায়নি। পরস্পর হাতে হাত মিলিয়ে হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সমস্ত আধিয়ার চাষীদের উপর শোষণ ও অত্যাচার চালিয়ে এসেছে।

জোতদারের মতই আধিয়ার চাষীরাও হিন্দু ও মুসলমান এই দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত। তারা পুরুষানুক্রমে জোতদারদের জমি আধিভাগে চাষ করে আসছে। হাল বলদ চাষীর, বীজধান চাষীর, মেহনত চাষীর—সে ব্যাপারে জোতদারের কোনই দায়-দায়িত্ব নেই। কিন্তু ফসল উঠলে পর তার অর্ধাংশ জোতদারের প্রাপ্য। এই রীতি দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে, আজও চলেছে। দেখে দেখে অভ্যস্ত হয়ে গেছে সবাই। ফলে এর মধ্য দিয়ে বর্গাচাষীদের উপর যে কি ভয়ানক শোষণ চলেছে, সে কথাটা চাপাই পড়েছিল। হতভাগ্য বর্গাচাষীরাও এই ব্যবস্থাকেই স্বাভাবিক ও অলঙ্ঘনীয় মনে করে নির্বিবাদে মাথা পেতে নিয়ে চলছিল।

প্রচলিত রীতি অনুযায়ী ফসল কাটার পর বর্গাচাষীরা তা নিয়ে জোতদারদের খোলানে তোলে। সেইখানেই ধান মাড়াই হয়। তারপর এই ভাগাভাগি। এই ভাগাভাগির ব্যাপারে জোতদারের কর্মচারীদের হাতের কৌশলে সরলপ্রাণ আধিয়ার চাষী অনেক ক্ষেত্রেই তার প্রাপ্য অর্ধেক ভাগ পায় না। যাও বা পায় তা তার ভোগে আসে না। জোতদার চাষীর প্রাপ্য ফসল থেকে মাড়াই খরচ, বরকান্দা খরচ এবং আরও নানা খরচের বাহানা করে সেই ধানের কতক অংশ আত্মসাৎ করে। চাষীরা অনুপায় হয়ে দাঁড়িয়ে

দাঁড়িয়ে তাই দেখে। সর্বশক্তিমান জোতদারের-কর্মচারীর সামনে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদটুকু করবার মত সাহস তাদের ছিল না।

কিন্তু আসল হিসাবের কথাটা বলতে এখনও বাকী রয়ে গেছে। প্রায় প্রত্যেকটি বর্গাচাষী যে যার জোতদারের কাছে ঋণের দায়ে আবদ্ধ। যখন ঘরে ধান ছিল না, তারা জোতদারের কাছ থেকে ধান কর্জ নিয়েছে। জোতদাররা কিন্তু এ বিষয়ে খুবই উদার। অভাবের কথা শুনলে করুণাবিগলিত কণ্ঠে বলে, তোদের এই বিপদের দিনে আমরা যদি না দেখি, কে দেখবে তবে!

ঋণদানের শর্ত এই যে, ফসল ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই যে পরিমাণ ধান কর্জ নিয়েছে তার দেড় গুণ ধান দিয়ে ঋণ পরিশোধ করতে হবে। একসঙ্গে বেশী ধান কর্জ দেওয়া হয় না ওদের ভালোর জন্যই। চাষীরা নাকি ভীষণ অমিতব্যয়ী, একসঙ্গে বেশী ধান পেলে সঙ্গে সঙ্গেই সবটা খরচ করে বসবে। তাই যখন দেয়, দু'চার দ্রোন ধার দেয়। ফলে চাষীকে কিছুদিন বাদে বাদেই জোতদারের দ্বারস্থ হতে হয়।

এই ভাবে মাসের পর মাস ধরে ঋণের বোঝা বেড়ে চলতে থাকে। অশিক্ষিত, সরলপ্রাণ চাষী। জোতদারের কর্মচারীদের কথাকেই তাদের বিশ্বাস করে নিতে হয়। জোতদারের কাছে কত ঋণ জমল, সেই হিসাব রাখবার মত বিদ্যা-বুদ্ধি তাদের নেই। জোতদারের খাতায় যে হিসাব লেখা থাকে সেইটাই প্রামাণ্য। কাগজপত্রে লেখা হিসাব, তার চেয়ে বড় প্রমাণ আর কি হতে পারে! তার বিরুদ্ধে কথা বলার মত সাহস কার আছে!

ফসল ওঠার পর ভাগাভাগি করার সময় সেই সর্বনেশে খাতাটা এসে হাজির হয়। ওই খাতাটা দেখলে চাষীদের ভয়ে যেন প্রাণ উড়ে যেতে চায়। ওরা ওটাকে বাঘের মতই ভয় করে। ভয়

করার কারণ আছে। খাতা খুলে হিসাব করে দেখা যায় কর্জের ধান শোধ দিলে পর চাষীর হাতে অতি সামান্য ধানই বাকী থাকে। এ নিয়ে তাদের সংসার আর কদিন চলবে! কিন্তু উপায় নাই, জোতদারের ঋণ পরিশোধ করে তারপর অন্য কথা। এই ঋণ আদায় করবার জন্য কোর্ট কাচারীর শরণাপন্ন হতে হয় না। জোতদারের লোকেরা কর্জের ধানের দেড়গুণ পরিমাণ ধান চাষীর ভাগের ধান থেকে তাদের গোলায় তুলে রাখে। চাষী বাদবাকী যৎসামান্য নিয়ে তার অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে দিতে ঘরে ফিরে যায়।

কোন কোন ক্ষেত্রে এমনও হয় যে, কর্জের ধান পরিশোধ করার পর চাষীর হাতে আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না। হতভাগা আধিয়ার চাষী খালি ডালা কুলো নিয়ে ঘরে ফিরে যায়। এজন্য কখনও কখনও এমনও দেখা গেছে, ক্ষেতের ধান ক্ষেতেই পড়ে আছে। চাষী আর মেহনত করে ধান কাটতে চায় না। বলে, কি হবে আর ধান কেটে, এর কিছুই তো আমার ভোগে আসবে না।

কিন্তু বেঁচে থাকতে হলে পেটকে তো বুঝ দিতেই হবে। তাই ফসল ওঠার মুখেই এই সমস্ত আধিয়ারকে কর্জের ধানের জন্য ধরা দিতে হয় তার জোতদারের কাছে। জোতদার তাকে বিমুখ করে না, তখনকার মত কাজ চালিয়ে যাবার জন্য দু চার দোন ধান দিয়ে তাদের বিদায় করে। জোতদার পাকা হিসাবী লোক, সে জানে গরু ঘোড়ার মত আধিয়ারকেও প্রাণে বাঁচিয়ে রাখা দরকার। তা না হলে তার জমিতে রক্ত জল করে ফসল ফলাবে কে। তাই তাকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য সে কিছু ধান কর্জ দিয়ে চলে। এইভাবে অধিয়ার চাষী আবার তার জোতদারের কাছে নতুন ঋণের বন্ধনে বাঁধা পড়তে থাকে।

এই ধারা বছরের পর বছর ধরে অব্যাহত গতিতে চলতে থাকে।

আধিয়ার তার জীবন ভর এই ঋণের বোঝা টেনে নিয়ে চলে। বেঁচে থাকতে এই ঋণের দায় থেকে মুক্তি পাবার কোন আশা নেই। এই দুঃখময় ক্লান্ত জীবনের বোঝা টেনে টেনে যেদিন সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে, কেবলমাত্র সেই দিনই তার মুক্তি। তাদের বাপ, পিতামহ, প্রপিতামহ সবাই এই একই ভাবে ঋণের বোঝা বহন করে এসেছে। সেও তার ছেলের কাছে এই একই উত্তরাধিকার দান করে পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়।

আধিয়ার তার জোতদারের কড়ি দিয়ে কেনা গোলাম নয়। তার দেহের উপর, বিষয়সম্পত্তির উপর, তার পরিবার-পরিজনদের উপর, তার জীবনযাত্রার উপর জোতদারের কোন আইনসঙ্গত অধিকার নেই। কিন্তু এ হচ্ছে নিছক আইনের কথা। কার্যত আধিয়ার জোতদারের কাছে ঋণের শিকল দিয়ে বাঁধা। সারা জীবন ধরে শরীরের মেহনত দিয়ে সে তার ঋণ শোধ করে চলতে থাকে। তাই তার নিজের ইচ্ছানুযায়ী স্বাধীন ভাবে জীবন যাপনের অধিকার তার নেই। আর তারই সুযোগ নিয়ে জোতদাররা তাদের আধিয়ারদের উপর এমন কোন জুলুম নেই, এমন কোন অত্যাচার নেই, যা করেনি। তাদের লালসা ছিল সর্বগ্রাসী। আধিয়ারদের ঘরের মেয়েরাও তাদের হাত থেকে রক্ষা পায় নি।

ইউরোপের সমাজ বিবর্তনের বিশেষ এক পর্যায়ে ভূদাস প্রথার উদ্ভব হয়েছিল। এই ভূদাসরা ক্রীতদাস না হলেও ভূস্বামীদের দুয়ারে বাঁধা ছিল। স্বাধীনভাবে জীবন যাপনের সুযোগ থেকে তারা ছিল বঞ্চিত। সেই ভূদাসদের জীবনধারার সঙ্গে আমাদের সমস্ত আধিয়ার চাষীদের জীবনধারার অনেকটা মিল আছে। ভূস্বামীদের অত্যাচার আর অভাবের জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে ইউরোপের সেই সমস্ত ভূদাসদের মধ্যে কেউ কেউ ঘরবাড়ী ছেড়ে যে যেদিকে

পারত পালিয়ে যেত। এখানকার আধিয়ারদের ভিতর থেকেও কেউ কেউ অভাবের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে জোতদারদের খপ্পর থেকে বাঁচবার জন্য নিজেদের কুঁড়েঘর ছেড়ে রাতারাতি নিরুদ্দেশ হয়ে যেত। কিন্তু কোথায় যাবে? যেখানে যাবে সেখানেই তো এই অবস্থা। কুমীর আর হাঙ্গরের দল সর্বত্রই যে শিকারের আশায় হাঁ করে বসে আছে। সাধারণত তারা জলপাইগুড়ির দিকে যেত, কিংবা তারও উত্তরে কোন জায়গায়, যেখানে গেলে দুবেলা পেট ভরে খেতে পারবে। কিন্তু কোথায় সেই জায়গা? যারা খেটে খায় তারা পেট ভরে খেতে পারে, এমন জায়গা কি কোথাও আছে? সেই গরীবের স্বর্গ, তা তো শুধু স্বপ্ন দেখার জিনিস, বাস্তবে তা মেলে?

ভুটান এই অঞ্চল থেকে উত্তর দিকে। সেই অজানা দেশ ভুটান সম্পর্কে মানুষ নানারকম কল্পনা করত। আধিয়ারদের মধ্যে যারা নতুন জীবনের সন্ধানে নিরুদ্দেশ হয়ে যেত, লোকে মনে করত তারা ভুটানে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। তাই স্থানীয় লোকের মুখের কথায় এই নিরুদ্দেশ হবার নাম ছিল "ভোটান যাওয়া"। মহাভারতের ভাষায় এর নাম বলা চলে "মহাপ্রস্থান পর্ব"। যারা "ভোটান গেছে" তারা চিরদিনের জন্য হারিয়ে গেছে। তাদের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব আর কোনদিন তাদের সন্ধান পায়নি।

একজন কৃষককর্মীর মুখে শুনলাম, তিনি একজন আধিয়ারের চরম দুরবস্থার কথা শুনে তার বাড়ীতে খোঁজ করতে গিয়েছিলেন। গিয়ে দেখলেন, তার কুঁড়েঘরটা পড়ে আছে। কিন্তু ঘরে মানুষ নেই। পাড়া প্রতিবেশীরা বলল, "আধাবল্লভ তো নাই, সে আত্রিবেলা কাস্তাই মাথাত নিয়ে বমুসের হাত ধরি ভোটান গেছে।" স্থানীয় কথ্য ভাষায় 'কাস্তাই' মানে কড়াই, আর 'বমুস' মানে বউ। তার

বক্তব্যটা হচ্ছে, "রাধাবল্লভ কাল রাত্রিবেলা তার কড়াইটা মাথায় নিয়ে বউয়ের হাত ধরে ভুটান চলে গেছে।" এই হচ্ছে নিরুদ্দেশ যাত্রীর চিত্র। সংসার পেতে বসবার জন্য তার পক্ষে কড়াইটা হচ্ছে প্রধান এবং সবচেয়ে প্রয়োজনীয় উপকরণ। এই কড়াইটিকে কেন্দ্র করেই আবার তার নতুন সংসার গড়ে উঠবে। এই আশা নিয়েই সে যাত্রা করেছে। এই যাত্রা কোথায় গিয়ে শেষ হবে কে জানে!

এখানকার সমাজে সংসার পরিচালনার মূল দায়িত্ব মেয়েদের উপর। সংসারের অধিকাংশ কাজকর্ম তারাই করে। রান্না-বান্না থেকে শুরু করে ঘর গৃহস্থলীর যাবতীয় কাজ, রান্না করবার কাঠকুটো সংগ্রহ করে নিয়ে আসা, গো-পালন, হাটবাজার করা, স্বামীকে তামাক সাজিয়ে খাওয়ানো, তার ফুট ফরমাইস খাটা—বহু কাজ করতে হয় মেয়েদের। সেই জন্য মেয়ে ছাড়া শুধু ঘর-সংসারের কাজ নয়, চাষ-বাসের কাজও অচল হয়ে পড়ে।

এক একজন জোতদারের অনেক স্ত্রী থাকত। এর কারণ প্রধানত অর্থনৈতিক। বেশী মেয়ে না থাকলে সম্পন্ন গৃহস্থের সংসারের যাবতীয় কাজ সামাল দেওয়া সম্ভব নয়। বিশেষ করে ধান তোলার মরসুমে বিয়ের সংখ্যাটা উল্লেখযোগ্য ভাবে বেড়ে যেত। এই অঞ্চলে একটা প্রচলিত কথা আছে, 'ধানের সময় ইঁদুর সাতটা বিয়ে করে'। ক্ষেতের ধান পাকার পর ইঁদুর বিস্তর ধান তার গর্তে নিয়ে মজুত করে। সেই সময় তার সংসারের কাজকর্ম বেড়ে যায় বলে একটা বউ দিয়ে কুলায় না, ইঁদুরকে সাতটা বউ ঘরে আনতে হয়। ইঁদুরের সাত বিয়ের কথাটার মধ্য দিয়ে সম্পন্ন গৃহস্থের সংসারের ছবিটি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

এই সমস্ত কারণে মেয়েদের চাহিদা বেশী। ছেলেদের উঁচু

মাত্রায় পণ দিয়ে বিয়ে করতে হয়। এই পণ প্রথা এখানকার গরীব চাষীদের সমাজে এক কঠিন সমস্যার সৃষ্টি করে তুলেছিলো। বহু আধিয়ার ও বেকার যুবক অর্থাভাবে বিয়ে করতে পারত না।

দুবেলা দুমুঠো ভাত জোটানোই যাদের পক্ষে দুষ্কর, কন্যার জন্য পণ তারা কেমন করে সংগ্রহ করবে? এমন অনেক লোক ছিল, যারা বহু চেষ্টা করেও পণের টাকা সংগ্রহ করে উঠতে পারেনি। তাদের বাধ্য হয়ে সারা জীবন কুমার-জীবন যাপন করে চলতে হয়েছে। ফলে সমাজের মধ্যে দুর্নীতি ছড়িয়ে পড়েছে। ছড়িয়ে পড়তে বাধ্য। সমাজের সুস্থ বিকাশের পক্ষে এ এক মারাত্মক সমস্যা। বিয়ের ব্যাপারে অকৃতকার্য এই সমস্ত যুবকরা এখানকার কথ্য ভাষায় 'ঢ্যানা' নামে পরিচিত। স্ত্রী লাভ না করতে পারার ফলে এরা এদের সংসার গড়ে তুলতে পারেনি, এদের জীবন ব্যর্থ হয়ে গেছে। এদের জীবনের এই করুণ কাহিনী নিয়ে অনেক গান রচিত হয়েছে। এই সব গান 'ঢ্যানার গান' নামে প্রচলিত। সেই ঢ্যানার গান থেকে দুটি টুকরো তুলে দেওয়া গেল:

১। বাপাই রে বাপাই
না যাইস্ বিদেশে।
কোষ্টার উপর টাকা নিয়া
তোর বিয়াও চৈতমাসে।

২। যখন আলোয়ার দুই পাতা,
তখন উঠিল ঢ্যানার বিয়ার কথা।
যখন আলোয়ার মাথাত ফুল,
তখন ঢ্যানার উঠিল ফালকুল।

প্রথম গানটিতে বাপ ছেলেকে বিদেশ যেতে নিষেধ করছে। ছেলে কন্যাপণ অর্জন করবার উদ্দেশ্যে বিদেশে যাবার জন্য উদ্যোগী

হয়েছিল। বাপ ছেলেকে আশ্বাস দিচ্ছে যে পাট বিক্রী করে যে টাকা পাওয়া যাবে, তাই দিয়ে সে চৈত্রমাসে তার বিয়ের ব্যবস্থা করবে। কাজেই পণের টাকা উপার্জন করবার জন্য বিদেশে যাবার প্রয়োজন নেই।

দ্বিতীয় গানটির 'আলোয়া' শব্দের অর্থ তামাক আর 'ফালকুল' মানে খুশী। তামাকের ফলনের উপর ঢ্যানার বিয়ে নির্ভর করছে। তামাক গাছে প্রথম দু'পাতা দেখা দিতেই ঢ্যানার বিয়ে সম্পর্কে কথা উঠল। তামাকের পাতায় যখন ফুল দেখা দেয়, তখন তামাক পাতা বিক্রীর পক্ষে উপযোগী হয়। সেই জন্য তামাক গাছের মাথায় ফুল দেখা দিয়েছে দেখে ঢ্যানার মনটা খুশী হয়ে উঠল। কেননা এই তামাক পাতা বিক্রী করেই তার বিয়ের ব্যবস্থা করা হবে। ঢ্যানা সেই আশায় দিন গুণছে। তামাক গাছের মাথায় ফুল দেখা দিলে তারও বিয়ের ফুল ফুটবে।

কিন্তু ঢ্যানার মনের আশা পূর্ণ হবে কিনা, কে বলবে। বছর বছর পাটও বিক্রি হয়, তামাক পাতাও বিক্রি হয়। কিন্তু তা দিয়ে যে টাকা ঘরে আসে, তা ঋণ শোধ দিতে আর সংসার খরচেই নিঃশেষ হয়ে যায়। ঢ্যানার মনের আশা মনেই মিলায়।

জোতদারদের ঘরের পাত্রদের কাছে বিয়েটা কোন সমস্যাই নয়। একটা কেন, টাকা খরচ করলে যত খুশী বিয়ে করতে পারে। শুধু যুবকদের কথাই নয়, যুবক, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ সকলেরই অবাধ সুযোগ রয়েছে। অথবা বৃদ্ধ তরুণী মেয়েকে বিয়ে করছে, এমন দৃষ্টান্ত অজস্র। যে মেয়ের দিকে তাদের চোখ পড়ে আর রোখ পড়ে, অর্থ আর প্রভাব প্রতিপত্তির জোরে তারা তাকে যোগাড় করে নেবেই। কে তাদের বাধা দেবে। তা ছাড়া বিয়ে না করেও ভোগ করার জন্য মেয়ের অভাব হয় না।

ওদিকে ভগ্নহৃদয় ঢ্যানারা শূন্যমনে এদিকে ওদিকে ঘুরে বেড়ায়, হতাশার দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে, কোন কাজে তাদের মন বসতে চায় না। ফলে যে সব জোতদারদের জমিতে তারা চাকর হিসাবে কাজ করে তাদের কাজের ক্ষতি হয়। জোতদাররা এই সমস্যার সমাধানের জন্য এক অভিনব উপায় উদ্ভাবন করেছিল। কি হিন্দু কি মুসলমান সমস্ত জোতদারদের ঘরেই দু' একজন করে 'আন্ধুনী বেটীছাওয়া' (রাঁধুনী মেয়ে) থাকে। চাকরদের জন্য রান্না করা ও তাদের মধ্যে খানা পরিবেশন করা তাদের কাজ। কিন্তু এ হল তাদের কাজের একটি দিক। অপর দিকে এরা রাত্রিবেলা ঢ্যানা চাকরদের কাছে দেহ দান করে।

এইভাবে হতভাগ্য ঢ্যানারা তাদের নিরুদ্ধ কামনা চরিতার্থ করবার কিঞ্চিৎ সুযোগ লাভ করত। আন্ধুনী বেটী ছাওয়াদের এই গোপন ভূমিকা কারো কাছেই গোপন ছিল না। জোতদাররা আন্ধুনী বেটী ছাওয়াদের টোপ দেখিয়ে ঢ্যানাদের কাজের মধ্যে আকৃষ্ট করে রাখত। ফলে যা ঘটবার তাই ঘটছিল, দিনের পর দিন সমাজদেহ দুর্নীতির ক্লেদে ক্লেদাক্ত হয়ে উঠছিল। সমাজের প্রভু জোতদাররা তাদের অর্থপিপাসা মিটাবার জন্য এইভাবে তাদের ঘরে ঘরে গণিকা বিপণি সাজিয়ে বসেছিল।

আজ থেকে বিশ বছর আগে রংপুরের আধিয়ার চাষীদের জীবন যাত্রার এই ছিল ছবি। এর মূলে ছিল জোতদারী ব্যবস্থার চূড়ান্ত অর্থনৈতিক শোষণ। এই পরিবেশের মধ্যে মানুষের মত বেঁচে থাকার উপায় ছিল না। ওরা সমস্ত দুঃখ-লাঞ্ছনা নিঃশব্দে সহ্য করে যেত, মুখ ফুটে প্রতিবাদ করবার মত সাহস ছিল না। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে তাদের ভিতরে ভিতরে যে বিক্ষোভ জমে উঠছিল, তারা নিজেরাও বোধ করি তার স্বরূপটা জানত না। তেভাগার

আন্দোলন যখন নিরুদ্ধ অগ্নিগিরির বক্ষ ভেদ করে বিস্ফোরিত হয়ে উঠেছিল, তখন উপরতলার প্রভুদের বুকে ভয়ের কাঁপন ধরে গিয়েছিল।

আর দেশের মানুষ মুগ্ধ বিস্ময়ে এইসব সংগ্রামী মানুষগুলির দিকে তাকিয়েছিল।

সে এক বিচিত্র কাহিনী।

শহিদ তন্নারায়ণ

□ □ □ □

গুলি চলার সময় আপনি কি সেই জায়গায় উপস্থিত ছিলেন?

না, প্রত্যক্ষদর্শী যাকে বলে, আমি তা নই। সে সময় আমি ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলাম না। তবে তারপর গুলি চলার প্রতিক্রিয়া হিসাবে যে সমস্ত ঘটনা ঘটল, আমি তাতে শরিক হবার সুযোগ পেয়েছিলাম। এ আমার পরম সৌভাগ্য। হাজার হাজার বিক্ষুব্ধ জনতার সংগ্রামী রূপ সেদিন তাদের মধ্যে একজন হয়ে প্রত্যক্ষ করতে সুযোগ পেয়েছিলাম। এই অভিজ্ঞতা বিপ্লবী জীবনকে গড়ে তোলার পক্ষে এক মহামূল্য উপাদান।

রংপুরের তেভাগা আন্দোলনের একজন বিশিষ্ট নেতার সঙ্গে আলাপ হচ্ছিল। শহিদ তন্নারায়ণের মৃত্যু সংক্রান্ত কাহিনী তাঁর মুখ থেকে শুনছিলাম।

বললাম, এ সব কথা বলবার মত লোক আপনারা দু' একজন ছাড়া আর কেউ তো নেই। আপনি যতটা সম্ভব বিস্তারিতভাবে বলুন, কিছু বাদ দেবেন না। আমি শুনবার জন্য উদ্‌গ্রীব।

তিনি বললেন, বিশ বছর আগেকার কথা। সেই কাহিনী

যথাযথভাবে আপনাকে শোনাব, আমার স্মৃতিশক্তি তেমন প্রখর নয়। মানুষগুলো আর ঘটনাগুলো কেমন যেন অস্পষ্ট আর এলোমেলো হয়ে গিয়েছে। ঘটনাগুলোর কোনটা আগে আর কোনটা পরে, তা নিয়ে প্রায়ই ভুল করে বসি। তা হলেও সেই সময়কার যে ছবি আমার চোখের সামনে ভাসছে, তা বোধ হয় কোনদিনই ঝাপসা হয়ে যাবে না। সেই ছবিটাই আপনার সামনে তুলে ধরবার চেষ্টা করব। আমার মনে হয় যতটুকুই বলতে পারি না কেন, আর যে ভাবে বলতে পারি না কেন, আজকের দিনে দেশবাসীর কাছে সেই সব কাহিনী পৌঁছে দেবার প্রয়োজন আছে।

অবশ্যই আছে, আমি জোর দিয়ে বললাম, সেই জন্যই তো আপনার কাছে এসেছি। আপনি বলুন।

তিনি বলে চললেন :

তেভাগা আন্দোলন তখন উঠতির মুখে। ধান কাটা শুরু হয়ে গিয়েছে। সমিতির নির্দেশ, কেউ আলাদাভাবে নিজের ধান কাটবে না। দলবদ্ধভাবে শৃংখলার সঙ্গে অনেকগুলি ক্ষেতের ধান অল্প সময়ের মধ্যে কেটে নিয়ে আসতে হবে, যাতে জোতদারেরা বাধা দেবার মত সময় বা সুযোগ না পায়। সমিতির এই নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালিত হচ্ছিল। সেদিন সবার চোখের সামনে এক নতুন দৃশ্য উদ্‌ঘাটিত হয়ে গেল। আমাদের দেশে এমন এক ঘটনা কেউ কোন দিন দেখেওনি, শোনেওনি। শত শত চাষী একসঙ্গে সারি বেঁধে ধান কেটে চলেছে, আর ক্ষেতের এক পাশে একদল লাঠিধারী ভলান্টিয়ার পাহারা দিচ্ছে।

এ কথা আগে থেকেই প্রচারিত হয়ে গিয়েছিল, এবারকার ধান প্রচলিত রীতি অনুযায়ী জোতদারদের খোলানে উঠবে না,

উঠবে আধিয়ারদের বাড়ীতে। জোতদারদের কানেও এ কথাটা গিয়ে পৌঁছেছিল। তাই আশঙ্কা করা গিয়েছিল, ধান কাটার সময় জোতদারেরা হয়তো তাদের দলবল নিয়ে এসে হামলা করবে। সেই হামলা প্রতিরোধ করবার জন্য সবাই প্রস্তুত হয়েছিল। এদিককার তোড়জোড় দেখে জোতদারেরা ভরসা পেল না। ওরা সামনে এল না, দূর থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল। নিজেদের সংঘবদ্ধ শক্তির পরিচয় পেয়ে চাষীদের উৎসাহ আরও বেড়ে গেল। ধান কাটার কাজ এগিয়ে চলল।

আমরা ক'জন কর্মী তখন আত্মগোপন করে কৃষকদের মধ্যে কাজ করে চলছিলাম। পুলিশের লোকেরা আমাদের গ্রেফতার করবার জন্য খোঁজ করে ফিরছিল। জোতদাররাও তাকে তাকে ছিল, সুযোগ পেলেই আমাদের পুলিশের হাতে ধরিয়ে দেবে। কোন কোন জোতদার আমাদের গুম করে ফেলবার জন্যও ষড়যন্ত্র আঁটছিল। সেই জন্যই আমাদের খুবই সতর্কভাবে চলতে হ'ত।

কিন্তু পলাতক বলতে সাধারণত যা বোঝায়, আমরা সব সময় সেই ভাবে আত্মগোপন করে চলতাম না। যে সমস্ত গ্রামে আমাদের সংগঠন মজবুত ছিল, সেগুলি ছিল আমাদের সুরক্ষিত দুর্গের মত। সেই সমস্ত গ্রামে, কি রাত্রিতে কি দিনের বেলায় আমরা প্রকাশ্যে ও অবাধে চলাফেরা করতে পারতাম। সেখানে মেয়ে-পুরুষ সবাই আমাদের আপনার লোক। তারা তাদের চোখের মণির মত আমাদের রক্ষা করে চলত। আর ছোট ছোট বাচ্চাগুলি, কি বলব, ওদের কাজের তুলনা হয় না। গোয়েন্দাগিরির কাজে ওরা ছিল ওস্তাদ। ওরা শিকারী কুকুরের মত গন্ধ শুঁকে শুঁকে বেড়াত। ফলে প্রতিপক্ষের গতিবিধি আমাদের নখদর্পণে থাকত।

সমিতির ভলান্টিয়ারেরা যে কোন সময় ওদের হামলা মোকাবিলা

করবার জন্য তৈরী থাকত। একটু সংকেতের অপেক্ষা মাত্র, অমনি দেখতে দেখতে শত শত ভলান্টিয়ার এসে জমায়েত হবে। পুলিশ বা জোতদারের কাছে এ কথা অজানা ছিল না। তাই তারা এ সমস্ত গ্রামের দিকে সহজে ঘেঁসতে চাইত না। আমরা কোথায় আছি, পুলিশের লোকেরা সেই খবর রাখত। কিন্তু তা সত্ত্বেও এ সব জায়গায় চড়াও হতে তারা সাহস করত না।

তন্নারায়ণের বাড়ী ছিল ডিমলা থানার খগাখড়িবাড়ী গ্রামে। এ গ্রামে কয়েক ঘর জোতদার। ধনবল আর জনবল দুদিক দিয়েই তারা শক্তিশালী। তারা ছাড়া গ্রামের আর সবাই আধিয়ার চাষী। ওখান থেকে কিছুটা দূরে এক গ্রামে আমার আশ্রয়। সেখান থেকে আমি এই অঞ্চলের আন্দোলনকে পরিচালনা করতাম।

সেদিন সন্ধ্যার কিছু আগে হাঁটতে হাঁটতে গ্রাম ছাড়িয়ে মাঠের দিকে চলে এসেছিলাম। সূর্য তখন অস্ত যাচ্ছে। পশ্চিমে খোলা মাঠ দিগন্ত পর্যন্ত বিস্তারিত। সেই বিরাট পটভূমিকায় অস্তগামী রক্তসূর্যের দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হয়ে গেলাম, স্তব্ধ হয়ে গেলাম। অস্তগামী সূর্যের সঙ্গে এমনিভাবে অনেক বারই মুখোমুখি দেখা হয়েছে, কিন্তু এত লাল কোনদিন দেখিনি তো! সিঁদুরের মত লাল? আগুনের মত লাল? না, রক্তের মত লাল? কি আশ্চর্য, বিশ বছর আগেকার সেই বিস্ময়ঘন অনুভূতির স্মৃতি এখনও আমার মনের মধ্যে কি করে বেঁচে আছে।

হঠাৎ দূরে একটা কোলাহলের শব্দ শুনে আমার ধ্যান ভেঙ্গে গেল। চমকে উঠলাম। শব্দটা খগাখড়িবাড়ীর দিক থেকে আসছে, সেটা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে। মনটা চঞ্চল হয়ে উঠল। গ্রাম্য ঝগড়াঝাটি, না আর কিছু? গ্রামাঞ্চলে এ-নিয়ে তা-নিয়ে ঝগড়া কাজিয়া হরহামেশা ঘটে থাকে। কিন্তু সময়টা

অস্বাভাবিক, আবহাওয়া উত্তেজনাময়, তাই একটুতেই মন উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে।

ঠিক এমনি সময় দুড়ুম দুড়ুম করে পর পর দুবার শব্দ শোনা গেল। বন্দুকের আওয়াজ! নাঃ, এবার আর সন্দেহের অবকাশ নেই, নির্ঘাত হামলা করেছে ওরা। কিন্তু এ অবস্থায় আমি—আমি কি করব? অবস্থাটা না জেনেশুনে ওখানে গিয়ে পড়াটা কি ঠিক হবে?

সন্ধ্যার আবছায়া নেমে এসেছে। তার মধ্যেও দেখতে পাচ্ছি এদিক থেকে ওদিক থেকে দলে দলে লোক ছুটে যাচ্ছে। যাবেই তো, বন্দুকের আওয়াজ সবার কানেই গিয়েছে। সমিতির নির্দেশ, কোথাও কোন বিপদের আভাস পেলে যে যেখানে থাক, যে অবস্থাতেই থাক, সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে গিয়ে চড়াও হতে হবে। খালি হাতে যাওয়া চলবে না, হাতের কাছে লাঠি-সোঁটা, দা-কুড়াল যা পাও তাই নিয়েই ছুটতে হবে।

আমার বাঁ দিকে ক'জন লোক ছুটে চলে যাচ্ছে। ওদের সবার আগে কালাচাঁদ। ওর মুখটা দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু দৌড়ের ভঙ্গি থেকেই বোঝা যাচ্ছে কালাচাঁদ ছাড়া আর কেউ নয়।

ডাকলাম, কালাচাঁদ, কালাচাঁদ—শোন, দাঁড়াও।

কিন্তু কে শোনে কার কথা! আমার ডাক ওদের কানে যায় নি। ওরা দেখতে দেখতে সন্ধ্যার অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

ওদিকে কোলাহল আরও বেড়ে উঠছে।

আর একটা দল ছুটতে ছুটতে আমার সামনে এসে থমকে দাঁড়াল।

কে? সামনের লোকটি প্রশ্ন করল।

দেখলাম আমাদের দীনদয়াল। এই অঞ্চলের সবচেয়ে ভাল কৃষককর্মী।

দীনদয়াল আর কালাচাঁদ এখানকার কৃষক সমিতির দুটি স্তম্ভ।

বললাম, আমি, দীনুভাই, আমি।

ও, দাদা? তা এমন সময় এখানে দাঁড়িয়ে কি করছেন তুমি? যান ঘরে যান।

কিন্তু খাগাখড়িবাড়ীর দিকে ও কি হচ্ছে দীনুভাই? জানেন আপনারা কিছু?

কেমন করে জানব? তাই দেখতেই তো যাচ্ছি। বন্দুকের শব্দ শুনতে পেলাম যে।

নিশ্চয় ওই শালাদের কাজ।

বললাম, চলুন, আমিও আপনাদের সঙ্গে যাব।

তুমি? তুমি কেন যাবেন? না, তোমার ওখানে যাওয়া চলবে না।

আহা, এমন অবস্থায় কি না গিয়ে পারা যায়!

না না, যেতে হবে না তোমাকে। তুমি কি সাধ করে ওদের হাতে ধরা দিতে চান নাকি? যান, ঘরে ফিরে যান।

দীনুভাইয়ের কণ্ঠে সুস্পষ্ট নির্দেশের স্বর। এতদিন ধরে নির্দেশ দিয়ে আসছি। আজ দীনদয়াল আমাকে নির্দেশ দিচ্ছে। অমান্য করবার শক্তি নেই আমার। কি করি, চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। ওরা ছুটে চলে গেল।

উদ্বিগ্ন হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। ইতিমধ্যে ওখানে কত কিছু ঘটছে কে জানে? বহু লোকের মিলিত আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। পরিষ্কার শোনা গেল আমাদের লোকেরা স্লোগান দিচ্ছে। কিন্তু কি বলছে, এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে না।

হঠাৎ দুড়ুম, দুড়ুম···বন্দুক পর পর গর্জন করে চলল। উঃ, কি হচ্ছে এ সব! এবার আর দীনুভাইয়ের নির্দেশ মান্য করে ঘরে ফিরে যেতে পারলাম না। হাতের কাছে কোন কিছু খুঁজে পেলাম না। খালি হাতেই ছুটলাম······ওদিকে।

ছুটতে ছুটতে খগাখড়িবাড়ীতে গিয়ে পৌঁছলাম। গিয়ে দেখি তন্নারায়ণের বাড়ীতে লোকের ভীড় জমে গেছে। গুলির আঘাতে মারা গেছে আমাদের তন্নারায়ণ। ভেবেছিলাম পুলিশের হামলা, তা নয়, জোতদারেরা দল বেঁধে এসে আক্রমণ করেছিল। ওরা ভালমত তৈরী হয়েই এসেছিল। সঙ্গে ছিল পাঁচ পাঁচটা বন্দুক। জোতদাররা আর তাদের দালালরা আচমকা পাড়ার মধ্যে ঢুকে পড়ে গুলি চালাতে শুরু করল। গুলি চালাবার কোনই অজুহাত ছিল না। ওরা চেয়েছিল গুলি চালিয়ে আতংকের সৃষ্টি করে চাষীদের মনোবল ভেঙ্গে দিতে। সামনে ছিল তন্নারায়ণ, গুলি খেয়ে উপুড় হয়ে পড়ে গেল। সেই যে পড়ল, আর উঠল না।

ওরা মনে করেছিল প্রাণের ভয়ে সবাই পালিয়ে যাবে, আর ওরা তাদের পিছন পিছন তাড়া করবে। যেমন করে শিকারী জংলা পশু শিকার করে, ওরা তাই করতে চেয়েছিল। কিন্তু ওরা যা চেয়েছিল, তা হ'ল না। বন্দুকের শব্দ শুনতে পেয়ে চারদিক থেকে দলে দলে লোক ছুটে এল। ওদের ওই মরণবর্ষী বন্দুকগুলিকে চ্যালেঞ্জ করে তারা ঝাঁপিয়ে পড়ল ওদের উপর; তাদের সবার আগে ছিল বাচ্চাই মামুদ। শান্ত নিরীহ প্রকৃতির বাচ্চাই মামুদ, শিশুর মত সরল হাসি যার ঠোঁটের কোণায় লেগেই থাকত, সেই সংকট-মুহূর্তে বাঘের মতই গর্জে উঠে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। ওরা তখন প্রাণের ভয়ে দিকবিদিক জ্ঞান হারিয়ে গুলি

চালাতে লাগল। গুলির ঘায়ে দশ পনেরো জন কৃষক জখম হয়ে পড়ে গেল। তাদের মধ্যে বাচ্চাই মামুদের অবস্থা সবচেয়ে গুরুতর। গুলিতে গুলিতে তার শরীর ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। কিন্তু তাতেও তাদের দমানো গেল না। তারা বেপরোয়া হয়ে ছুটে আসছে লাঠি দিয়ে বন্দুকের সঙ্গে লড়াই করতে। জোতদাররা প্রমাদ গণল। অবস্থা বেগতিক দেখে তারা কোনমতে প্রাণ নিয়ে পালাল।

ভীড় ঠেলে তন্নারায়ণের মৃতদেহের পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। স্থির হয়ে শুয়ে আছে তন্নারায়ণ, যেন পরম শান্তিতে ঘুমিয়ে আছে। ওর পাশে একটি মেয়ে মাথা কুটে কেঁদে মরছে। কৃষককর্মীরা তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের চোখে জল নেই। প্রতিহিংসার আগুনে চোখের জল শুকিয়ে গেছে।

পুলিশ আসছে, পুলিশ! চারদিকে সাড়া পড়ে গেল।

ছুটে এলেন দীনুভাই। বললেন, এতো করে মানা করলাম, তবু আপনি এলেন! কি এমন দরকার ছিল আসবার!

আমরা কয়েকজন তাড়াতাড়ি সেখান থেকে সরে পড়লাম। কাছেই ছিলাম। খবর পেলাম পুলিশের লোকেরা সকলের আপত্তি অগ্রাহ্য করে তন্নারায়ণের মৃতদেহ ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। আমরা ভেবেছিলাম শহিদের মৃতদেহ নিয়ে আমরা মিছিল বার করব। কিন্তু আমাদের সেই ইচ্ছা পূর্ণ হ'ল না।

থানা এখান থেকে কাছে নয়। ঘটনাটা ঘটবার সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশ কেমন করে টের পেয়ে গেল, কেমন করেই বা এত তাড়াতাড়ি সদলবলে ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছল। বোঝা গেল এ ব্যাপারে থানার সঙ্গে জোতদারদের আগে থেকেই যোগসাজস ছিল। পুলিশ লোকচক্ষুর আড়ালে কাছেই আর কোথাও অপেক্ষা করছিল। সময় হতেই চলে এসেছে।

জোতদারদের এই নৃশংস আক্রমণ ও তন্নারায়ণের হত্যা কৃষকদের মনে আগুন ধরিয়ে দিল। সারা অঞ্চলের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত উত্তেজনার ঢেউ আছড়ে ভেঙ্গে পড়তে লাগল। সেই রাত্রিতেই গ্রামে গ্রামে আওয়াজ উঠল—তন্নারায়ণের হত্যার প্রতিশোধ চাই। ওরা গুলি চালিয়ে সংগ্রামী কৃষকদের মনে আতংক ছড়াতে চেয়েছিল, কিন্তু ফল হ'ল বিপরীত। এই সংঘাত, রক্তপাত ও হত্যার মধ্য দিয়ে কৃষকেরা নতুন চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠল। এতদিন যারা পিছনে পিছনে থাকত, আজ তারাও এগিয়ে এল সামনে। ওদিকে বলদর্পী জোতদার প্রভুরা বন্দুক শিয়রে নিয়ে দুর্ভাবনায় রাত্রি যাপন করল। তাদের চোখেও ঘুম ছিল না।

পরদিন তন্নারায়ণের হত্যার প্রতিবাদে কৃষকদের মিছিল বার করা হ'ল। বিরাট মিছিল। এত বড় মিছিল ইতিপূর্বে এ অঞ্চলে কেউ কোনদিন দেখেনি। শুধু কৃষক নয়, কৃষক ছাড়াও অন্যান্য বৃত্তির শ্রমজীবী মানুষ—জেলে, জোলা, কামার, কুমার, মুচি সবাই এসে যোগ দিয়েছে এই মিছিলে। জোতদাররা তখনকার মত সামাজিকভাবে একেবারেই কোণঠাসা হয়ে পড়েছিল। তাদের অনুগ্রহজীবী দালালরা ছাড়া তাদের পক্ষ হয়ে কথা বলার মত আর কেউ ছিল না।

নানা গ্রাম প্রদক্ষিণ করে মিছিল খগাখড়িবাড়ীতে এসে থামল। এখানে জোতদারদের বাড়ীর সামনেই সভা করল তারা। কৃষকদের মিলিত কণ্ঠের আওয়াজে সারাটা গ্রাম থেকে থেকে কেঁপে উঠছিল। সেই আওয়াজ শুনে গুর গুর করে কেঁপে উঠছিল জোতদারদের বুক। এ কেমন এক জমানা এসেছে, যে সব কথা ভাবা যায়নি কোনদিন, তা আজ স্বচ্ছন্দে ঘটে চলেছে। পুরানো দিনের রীতিনীতি, নিয়মকানুন সব কিছুই যে ভেঙেচুরে মিশমার হয়ে

যাচ্ছে। যে সমস্ত আধিয়ার চাষী এতদিন জোতদারদের পায়ের তলায় পড়ে থাকত, আর একটু বেয়াদবী করলে তাদের পায়ের চাপে থেঁতলে যেত, তারাই কিনা আজ জোতদারদের মুখের সামনে দাঁড়িয়ে গলা ফাটিয়ে বলে চলেছে: "তন্নারায়ণের হত্যার প্রতিশোধ চাই", "আধির বদলে তেভাগা চাই", "জোতদারী প্রথা ধ্বংস হোক" এবং আরও কত কি। কালের এই অবিচার দেখে জোতদারেরা হয়তো বিষণ্ণ মনে এই সব কথাই ভাবছিল।

ওদিকে সভায় শহিদ তন্নারায়ণের নামে সবাই শপথ গ্রহণ করছিল যে, তারা দেশের শত্রু, দশের শত্রু এই সমস্ত জোতদারদের সমাজ থেকে একঘরে ও কোণঠাসা করে ছাড়বে। জোতদারদের কাছে কেউ কোন জিনিস বিক্রী করবে না। জেলেরা মাছ দেবে না, তরকারীওয়ালারা তরকারী দেবে না, দুধওয়ালারা দেবে না দুধ। দেখা যাক কি খেয়ে ওরা বাঁচে। ওরা পরেরটা খেয়ে বেঁচে থাকে, নিজেরা কোন জিনিস ফলাতে পারে না। ওদের মত অক্ষম আর কে আছে।

সভায় আরও এক প্রস্তাব নিল তারা। প্রস্তাব নিল যে এই হত্যাকারী জোতদারদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও বিক্ষোভকে শুধুমাত্র খগাখড়িবাড়ী বা ডোমার থানা এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখলে চলবে না। একে ছড়িয়ে দিতে হবে সারা নীলফামারী মহকুমায়, ছড়িয়ে দিতে হবে জেলার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে। শহিদ তন্নারায়ণের রক্তের বীজে সারা দেশময় বিদ্রোহের ফসল ফলিয়ে তুলতে হবে। তবেই সার্থক হবে তন্নারায়ণের জীবন দান। স্থির হ'ল পরদিন দুপুরের পর বিক্ষোভ মিছিল মহকুমা শহর নীলফামারীর দিকে যাত্রা করবে।

এখান থেকে নীলফামারী শহর আঠাশ মাইল। মাঝপথে

দশ মাইল দূরে ডোমার। সেখানে কৃষক সমিতির একটি ঘাঁটি আছে। ঠিক হ'ল ডোমারে রাত কাটিয়ে পরদিন নীলফামারী যাওয়া হবে।

পরদিন মিছিল যাত্রা করল। মিছিল অনেক দেখেছি, কিন্তু এই মিছিলের কথা আমি কোনদিন ভুলতে পারব না। এ তো মিছিল নয়, এ যেন এক পার্বত্য নদী, সমস্ত বাধাবন্ধ ভেঙে চুরে উদ্দাম বেগে ছুটে চলেছে। এতদিনের অচল সমাজব্যবস্থার গুরুভারের চাপে নিষ্পিষ্ট নির্জীব কৃষকের চলার ছন্দে কোথা থেকে এল এই নতুন গতিবেগ? মিছিল ছুটে চলেছে। কেউ জানে না কেন, কেউ হাঁটছে না, সবাই ছুটছে, যেমন করে যুদ্ধের বিউগলের ডাকে সৈনিকরা প্রাণ দেওয়া-নেওয়ার খেলায় উন্মত্ত হয়ে ছুটে চলে। ভাবছি, এই অদম্য প্রাণবেগ এতদিন কোথায় চাপা পড়ে ছিল।

মিছিলে যারা শরিক হয়েছে, তাদের প্রত্যেকের হাতে লাঠি। খালি হাত কারু নেই। আমারও না। আমরা এগিয়ে চলেছি, আর দুপাশের গ্রাম থেকে দলে দলে লোক এসে মিছিলে যোগ দিচ্ছে। লোকের পর লোক আসছে, বুড়ো থেকে কিশোর পর্যন্ত সব বয়সের লোকই আছে। নিরীহ, শান্তশিষ্ট, গোবেচারী মানুষগুলি, যাদের কথা ভাবতেও পারিনি, তারাও চলে আসছে। প্রতিদিনের অতি পরিচিত মানুষগুলি, তাদের চোখ মুখের ভাব কেমন যেন বদলে গেছে। তাই চেনা লোককে নতুন করে চিনে নিতে হচ্ছে।

গফুর দফাদারের বাড়ীর গা ঘেঁষে যে রাস্তাটা গেছে, আমাদের মিছিল সেই পথ ধরে চলছে। দফাদারের বাড়ীর পাশ দিয়ে যেতে যেতে উৎকর্ণ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়তে হল। শুনলাম দফাদার তার ছেলেকে ডেকে বলছে, যা, যা, এই মিছিলের সঙ্গে যা। আমার

যাওয়ার উপায় নেই, নইলে আমিও যেতাম। ওঠ্, তাড়াতাড়ি কর্, মিছিল চলে যাচ্ছে যে। কথা শুনে চাঙ্গা হয়ে উঠল মনটা। ইচ্ছা হল ছেলেটিকে একবার দেখে নি। কিন্তু সাধ্য কি। পিছন থেকে প্রবল চাপ পড়ছে। এগিয়ে চলেছে জনস্রোত, ঠেলে নিয়ে চলেছে আমাকে, দাঁড়িয়ে থাকার উপায় নেই।

সবাই ছুটছে, আমিও ছুটছি। কিছুক্ষণ থেকে পায়ের স্যাণ্ডেল জোড়া বড় বেশী গোলমাল করছে। ওদের টনে টেনে এই মিছিলের সঙ্গে তাল রক্ষা করে চলা ক্রমেই কষ্টকর হয়ে দাঁড়াচ্ছে। আর কোন উপায় না দেখে পা থেকে স্যাণ্ডেল জোড়া খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। কি করা যাবে, যারা চলার পথে পদে পদে বাধা দেয়, প্রয়োজন হলে তাদের মায়া কাটাতেই হয়।

মিছিল ডোমারে এসে থামল। তখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে। এতগুলো লোকের খাওয়া দাওয়ার কি ব্যবস্থা হবে, তাই ভেবে স্থানীয় কৃষক-কর্মীরা চিন্তিত হয়ে উঠলেন। কিন্তু সাহায্যের জন্য পথে বেরোতেই দুর্ভাবনা দূর হয়ে গেল। কৃষকদের এই বিরাট মিছিল দেখে সারা অঞ্চল জুড়ে সাড়া পড়ে গিয়েছিল। স্থানীয় লোকেরা এগিয়ে এল সামনে। কৃষক ভাইদের খাওয়াবার জন্য তারা প্রচুর চাল ডাল তুলে দিল।

এমন সময় এক দুঃসংবাদ এসে পৌঁছল। সৈয়দপুরে হিন্দু মুসলমানে দাঙ্গা বেঁধে গেছে। দাঙ্গার ফলে লোকও নাকি মারা গেছে অনেক। অনেকেই বলাবলি করছে, দাঙ্গা এবার চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে, কেউ ঠেকাতে পারবে না। উজ্জ্বল আকাশের বুকে কোথা থেকে নেমে এল কালো মেঘ। মিছিলের অভিযাত্রীরা স্তব্ধ হয়ে গেল।

কিন্তু এই সংকটের মুখে নিষ্ক্রিয় দর্শকের মত দাঁড়িয়ে থাকলে

চলবে না। দাঙ্গাকে প্রতিরোধ করবার ব্যাপারে আমরা যদি প্রথম থেকেই আমাদের যথাযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করতে না পারি, তবে তার পরিণাম মারাত্মক হয়ে দাঁড়াতে পারে। দাঙ্গাকারীরা যদি একবার তাদের বর্শাফলক আমাদের কৃষকদের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিতে পারে, তাহলে এতদিনের পরিশ্রম আর এত লোকের এত ত্যাগের বিনিময়ে আমরা যেটুকু গড়ে তুলেছি, তার সব কিছুই চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। কাজেই দাঙ্গাকে প্রতিরোধ করতেই হবে। এই মুহূর্তে এর চেয়ে বড় কাজ আর কিছুই নেই। এই কথাটা আমরা বুঝিয়ে বললাম সবাইকে। অনেক রাত পর্যন্ত এই সমস্যা নিয়ে আলোচনা চলল। পরদিন আমাদের মিছিল যাত্রা করল নীলফামারীর দিকে। দাঙ্গাকে প্রতিরোধ করতেই হবে। এই পণ নিয়ে এগিয়ে চললাম আমরা।

নীলফামারী শহরে তখন প্রবল উত্তেজনা। সৈয়দপুর থেকে দাঙ্গা সম্পর্কে সত্যে মিথ্যায় মেশানো নানা খবর চলে আসছে। দাঙ্গা বাঁধিয়ে তুলবার জন্য উস্‌কানি দেবার মত লোকের অভাব নেই শহরে। তারা নানা রকম আজগুবি খবর ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে। ফলে শহরের বাসিন্দাদের মধ্যে দারুণ আতংক ছড়িয়ে পড়েছে। সেই আতংক আরও বেশী হল যখন পুলিশের লোকেরা সৈয়দপুরের দাঙ্গায় নিহত লোকদের মৃতদেহ ট্রাকে করে নীলফামারী শহরের মর্গে পৌঁছে দিয়ে গেল। দাঙ্গা বাঁধানো যাদের মতলব, তারা এই সুযোগটাকে কাজে লাগাতে ত্রুটি করছিল না।

বিকেল বেলা শহর হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠল। রব পড়ে গেছে, ওরা আসছে—এসে পড়ল বলে। কারা আসছে, কারা? আর কারা! সৈয়দপুর শেষ করে ওরা এখন নীলফামারীতে হামলা করতে আসছে। আর রক্ষা নেই এবার। কে নিয়ে এল এই খবর?

কে আর আনবে, খবর এবার নিজেই চলে আসছে। শুনতে পাচ্ছ না গোলমালের শব্দ? কথা মিথ্যা নয়। দূর থেকে বহু লোকের কোলাহলের শব্দ শোনা যাচ্ছে। শব্দটা ক্রমেই এগিয়ে আসছে। একটু বাদেই দেখা গেল ধুলায় আকাশ ঢেকে গিয়েছে। বহু লোক আসছে। ওরা একটা হাঙ্গামা বাঁধাতে আসছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তা না হলে এমন সময় এভাবে দল বেঁধে কারাই বা আসতে পারে! হিন্দুরা বলল, মুসলমানরা আসছে। মুসলমানরা বলল, হিন্দুরা আসছে। হিন্দু মুসলমান দুই সম্প্রদায়ই আতঙ্কগ্রস্ত। ভয়ার্ত মানুষগুলি অস্থির হয়ে ছুটোছুটি করছে। কি করবে, কেমন করে কি সামলাবে সেই চিন্তায় দিশাহারা। দেখতে দেখতে শহরের দোকানপাট বন্ধ হয়ে গেল।

এমন সময় হঠাৎ আবহাওয়াটা বদলে গেল। যারা স্বচক্ষে তাদের দেখেছে, তারা ছুটে এসে খবর দিল, যারা আসছে তারা দাঙ্গাবাজ নয়। তারা লালঝাণ্ডা নিয়ে মিছিল করে আসছে। লালঝাণ্ডা চিরদিনই দাঙ্গার বিরুদ্ধে, একথা সকলেরই জানা আছে। যারা লালঝাণ্ডার ঘোর শত্রু তারাও প্রকাশ্যে না হলেও নিজেদের মধ্যে এ কথা স্বীকার করে। ওরা নাকি আওয়াজ তুলছে, "দাঙ্গাবাজরা নিপাত যাক", "কৃষক সমিতি জিন্দাবাদ", আরও কত কি! ভয় নেই, ভয় নেই, ওরা কৃষক সমিতির লোক। খবরটা শুনে লোকে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল।

আমাদের এই মিছিল যখন নীলফামারীতে গিয়ে পৌঁছল, শহরের বহু লোক আমাদের এগিয়ে নিতে এল। শহরের পরিস্থিতি তাদের মুখে শুনলাম। আরও একটা উল্লেখযোগ্য খবর পাওয়া গেল। ডিমলা থানা এলাকার কোন কোন নামজাদা জোতদার নাকি প্রাণের ভয়ে ঘরবাড়ী ছেড়ে সৈয়দপুরের কাছেই কোথাও

আশ্রয় নিয়ে আছে। অনেকেই বলছে, এই দাঙ্গার উসকানীর ব্যাপারে ওদের নাকি কিছুটা হাত আছে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার আবর্ত সৃষ্টি করে ওরা কৃষকদের সংগ্রামকে ডুবিয়ে দিতে চায়।

আমাদের মিছিল সারা শহর প্রদক্ষিণ করল। আমাদের দাঙ্গাবিরোধী ও জোতদারবিরোধী ধ্বনিতে শহর মুখরিত হয়ে উঠল। আর দেরী নয়, সেই দিনই দাঙ্গা প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে কৃষক সমিতির নামে জনসভার আহ্বান দেওয়া হ'ল।

কৃষকদের ডাকে শহরবাসীরা অদ্ভুতভাবে সাড়া দিল। এই অল্প সময়ের নোটিশে সারা শহর যেন সভার ময়দানে ভেঙে পড়ল। দেখলাম শহরের লোকেরা কৃতজ্ঞতা আর সশ্রদ্ধ বিস্ময়ের দৃষ্টি নিয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। চিরদিনের অবহেলার পাত্র অজ্ঞ অশিক্ষিত কৃষক যে এমন সুশৃংখল ও সুসংগঠিত বাহিনী গড়ে তুলতে পারে, এ কথা তারা কল্পনাও করতে পারেনি এই কথাটিই নানা জনে নানা ভাবে প্রকাশ করছিল।

একজন সুপরিচিত কংগ্রেসকর্মী উচ্ছ্বসিত হয়ে বলছিলেন, আজ আপনারা যা দেখালেন, তার মধ্য দিয়ে আমরা এক নতুন সম্ভাবনার ইঙ্গিত দেখতে পাচ্ছি। গ্রামে গ্রামে যদি এই ধরনের সংগঠিত কৃষক-বাহিনী গড়ে উঠতে থাকে, তা হলে শুধু দাঙ্গাবাজ বা অত্যাচারী জমিদার জোতদারেরাই নয়, তাদের সর্দার খোদ বৃটিশ সরকারকেও শেষ নিঃশ্বাস ছাড়তে হবে।

তা তো হবেই, উত্তর দিলাম আমি, আর সেই সংকল্প নিয়েই তো কাজ করে চলেছি আমরা।

সভার কাজ শুরু হয়ে গেল। কৃষক নেতা দীনেশ লাহিড়ী তাঁর স্বচ্ছ সরল গ্রাম্য ভাষায় জোতদারদের অত্যাচার, কৃষকদের

বাঁচার আন্দোলন এবং শহিদ তন্নারায়ণের জীবনদানের কাহিনী বর্ণনা করে বক্তৃতা দিলেন। তিনি আরও বললেন, জোতদাররা ও তাদের দালালরা আজ কৃষকদের আন্দোলনের চাপে মরিয়া হয়ে নানা রকম অশান্তি ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামার সৃষ্টি করে তাদের নিজেদের স্বার্থ হাসিল করে নিতে চাইছে। কাজেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে সার্থকভাবে নিঃশেষ করতে হ'লে এই দাঙ্গার মূলে যে সব অশুভ শক্তি কাজ করে চলেছে, তাদের উপর মৃত্যু-আঘাত হানতে হবে।

সভা শেষ হওয়ার আগে আমাদের কৃষক বাহিনীর লোকেরা তাদের হাতের লাঠি উঁচু করে তুলে ধরে শপথ গ্রহণ করল যে দাঙ্গাবাজ জোতদারদের ষড়যন্ত্রের ফলে একটি লোকও যদি প্রাণ হারায়, তাহলে তারা সর্বপ্রথম সেই সমস্ত জোতদারদের মাথা নেবে, তারপর অন্য কথা।

সভার পর শহরবাসীদের সঙ্গে আলাপ করে দেখলাম, আমাদের এই মিছিল ও সভার ফলে শহরের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বদলে গেছে। দাঙ্গা সম্পর্কে মানুষের মনে যে আতংক ছিল, তা প্রায় দূর হয়ে গেছে। তাদের মনে আত্মবিশ্বাস ফিরে আসছে। স্থানীয় রাজনৈতিক কর্মীরা বললেন, দাঙ্গা প্রতিরোধের জন্য তাঁরা অবিলম্বে হিন্দুমুসলমানের মিলিত শান্তিরক্ষীবাহিনী গঠন করবেন বলে স্থির করেছেন। নীলফামারীর বুকে দাঙ্গাকে ঢুকতে দেওয়া হবে না। না, কিছুতেই না।

তাঁদের কথা শুনে আমাদের মন উৎসাহে ভরে উঠল। ভাবলাম, শহীদ তন্নারায়ণের জীবনদান ব্যর্থ হয় নি। সার্থক হয়েছে আমাদের এই অভিযান।

এই পর্যন্ত বলেই থেমে গেলেন তিনি। ভেবেছিলাম, আরও

কিছু বলবেন। দু-এক মিনিট নিঃশব্দে কেটে গেল। আর তিনি মুখ খুললেন না।

প্রশ্ন করলাম, আপনারা নীলফামারীতে গিয়ে শুনেছিলেন আপনাদের ওখানকার জোতদাররা প্রাণের ভয়ে তাদের ঘরবাড়ী ছেড়ে চলে গিয়েছিল। কথাটা কি সত্য?

তিনি উত্তর দিলেন, সত্যি বইকি। নীলফামারী থেকে ফিরে গিয়ে আমরা দেখলাম, ডিমলা থানা এলাকার বড় জোতদারদের মধ্যে অনেকেই ঘরবাড়ী ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছে। বহুদিন আগেকার কথা হলেও সেই সময়কার একটা ঘটনা স্পষ্ট মনে পড়ছে। ওদের মধ্যে কারা পালিয়েছে, আর কারাই বা আছে—খোঁজ নেবার জন্য ঘুরতে ঘুরতে একদিন জোতদার রমেশ সিং-এর গ্রামে গেলাম। রমেশ সিং-এর বাড়ীর সামনে বিরাট এক বটগাছ। বটগাছটার তলা দিয়ে যাচ্ছি, এমন সময় মাথার উপরে গানের শব্দ শুনে চমকে উঠলাম। উপর দিকে চেয়ে দেখি একটা জোয়ান ছেলে বটের ডালের উপর পা ছড়িয়ে বসে মনের আনন্দে গান গাইছে। আমাদের সঙ্গে একজন স্থানীয় কৃষক ছিল। সে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, আরে, ও তো অমেশ জোতদারের চাকর ধনা ঢ্যানা। রংপুরে গ্রাম্য ভাষায় ঢ্যানা বলে তাদের, যারা অর্থাভাবে পাত্রী সংগ্রহ করতে না পেরে বাধ্যতামূলক কুমার-জীবন যাপন করে। ঢ্যানার জীবনের সবচেয়ে বড় কামনা একটি "বেটী ছাওয়া" (মেয়ে), যার অভাবে তার জীবন ব্যর্থ, নিষ্ফল। সে সকলের করুণার পাত্র। স্বাভাবিক মানুষের মত সে সংসারে মূল ছড়িয়ে বসতে পারে না। এক অর্থহীন, শূন্য জীবন বহন করে সে কেবল স্রোতের শ্যাওলার মত ভেসে ভেসে বেড়ায়।

ধনা প্রাণ খুলে গান গাইছিল,

বন্নুসের হাত ধরি অমেশ ভোটান যায়।
ধনা এবার একটা বেটী ছাওয়া চায়।

গানের পদকর্তা ধনা নিজেই, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এখানকার কৃষকদের কথ্য ভাষায় "বন্নুস" কথার মানে বউ, আর "ভোটান যাওয়া" (ভুটান যাওয়া) মানে চরম দুরবস্থায় ঘরবাড়ী ছেড়ে দেশান্তরে পালিয়ে যাওয়া। গানের অর্থ, রমেশ তার বউকে নিয়ে ঘরবাড়ী ছেড়ে দেশান্তরে পালিয়ে গিয়েছে। রমেশের মত অন্যান্য জোতদাররাও পালিয়েছে। গরীব চাষীদের দুঃখ দুর্দশা এবার দূর হয়ে যাবে, যার যা কাম্য সব কিছুই মিলবে। ধনা এখন আর কিছু চায় না, চায় শুধু একটি মেয়ে, একটি জীবনসঙ্গিনী, যাকে পেয়ে তার জীবন-যৌবন সার্থক ও পূর্ণ হয়ে উঠবে।

শুধু ধনা নয়, জোতদারদের দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাবার ফলে কৃষকদের মধ্যে অনেকের মনই আশায় আনন্দে নেচে উঠেছিল। তারা ভাবছিল, জোতদারদের সাথে সাথে জোতদারী প্রথাও চিরদিনের জন্য দেশ ছেড়ে পালিয়েছে। তবে বুঝি এতদিনে মুক্তির দিন এসে গেল। কিন্তু এ তো সংগ্রামের প্রথম ধাপ মাত্র। লক্ষ্যস্থলে পৌঁছতে হলে আরও দীর্ঘ, বন্ধুর ও রক্তাক্ত পথ অতিক্রম করে যেতে হবে। বছরের পর বছর ধরে বহু কঠিন ও তিক্ত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে পূর্ব বাংলার কৃষকদের আজ সেই শিক্ষা গ্রহণ করতে হচ্ছে। শহিদ তন্নারায়ণ তার জীবন দিয়ে সেই পথের পাথেয় জুগিয়ে গিয়েছেন।

অনির্বাণ স্ফুলিঙ্গ

□ □ □ □

কেউ বলে চাটিভাই, কেউ বলে চাটিদা, আবার কেউ বা বলে চাটি মোহাম্মদ। আসল নাম জামশেদ আলি চাটি। নামটা শুনে প্রথমে একটু ভড়কে গিয়েছিলাম। পূর্ব বাংলার এক কৃষক কর্মী, তার নাম কিনা জামশেদ আলি চাটি! শুনলেই মনে হয় একটা হোমরা চোমরা কেউ-কেটা গোছের লোক হবে। আরও মনে হয়েছিল, সম্ভবত কোন অবাঙ্গালী ভাগ্যচক্রে ঘুরতে ঘুরতে এসে এখানকার মাটির বাসিন্দা হয়ে গেছে। নামের পিছনে অপরিচিত 'চাটি' শব্দটা এই ধারণার সৃষ্টি করে তুলেছিল।

কিন্তু ভুলটা ভাঙতে সময় লাগল না। যখন পরিচয় হল এবং মাত্র পাঁচ মিনিটের মধ্যেই সেই পরিচয় ঘনিষ্ঠতায় রূপান্তরিত হয়ে গেল, তখন প্রশ্ন করে জানলাম, যে 'চাটি' শব্দটা আমার মনে সম্ভ্রমের সৃষ্টি করে তুলছে, তা তার মার দেওয়া আদরের ডাকনাম। সেই মা'র দেওয়া 'চাটি' নাম কেমন করে যেন তার বাবার দেওয়া নাম 'জামশেদ আলির' সঙ্গে অবিচ্ছিন্নভাবে যুক্ত হয়ে গিয়েছে।

রংপুর শহর থেকে জনৈক বন্ধু বলে গিয়েছিলেন, ডিমলা দেখতে

যাচ্ছেন, কিন্তু কি দেখবেন আজ সেখানে গিয়ে। একদিন এই ডিমলা অঞ্চল রংপুর জেলার কৃষক আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু সে সময়কার সেই সব আন্দোলনের কাহিনী আজ প্রাচীন দিনের উপকথার মত ক্রমেই বিস্মৃতির আড়ালে মিলিয়ে যাচ্ছে। তাদের ধরে রাখবার মত কেউ নেই। তবে স্মৃতির কণাগুলি ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে ছড়িয়ে আছে। খোঁজ করে দেখলে তাদের মধ্যে হয়তো কিছু কিছু পেলেও পেতে পারেন।

হঠাৎ কি একটা কথা মনে পড়ে গেল তাঁর। বলে উঠলেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে। চাটিভাই আছেন—আমাদের ইনডমিটেবল চাটিভাই। তাঁর সঙ্গে দেখা করুন গিয়ে। তাঁর কাছ থেকে কিছু না কিছু অবশ্যই পাবেন।

চাটিভাই। তিনি আবাব কে? প্রশ্ন করলাম।

সেই পুরনো দিনের এক কৃষক কর্মী। দেখবার মত জিনিস বটে। আজকের দিনে এই প্রতিকূল আবহাওয়ার মাঝখানে যখন প্রায় সবাই 'আর কিছু হবে না' বলে হাল ছেড়ে দিয়ে বসে আছে, তখনও তিনি তাঁর সেই আদর্শ আর বিশ্বাসকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরে আছেন। মনে হয় একগাদা ছাইয়ের মধ্যে একটি অনির্বাণ স্ফুলিঙ্গ। এই স্ফুলিঙ্গ কোথাও থেকে কোন ইন্ধন পায় না, আপনাকে পুড়িয়ে আপনি জ্বলে। এই স্ফুলিঙ্গ কিছুতেই নিভে যেতে রাজী নয়।

অনির্বাণ স্ফুলিঙ্গ। কথাটা রয়ে গেল আমার মনে।

ডিমলা গিয়েই আর কোন কথা নয়, জুটে পড়লাম চাটিভাইয়ের সঙ্গে। চাটিভাই আমাকে পেয়ে উৎসাহে উজ্জ্বল হয়ে উঠলেন। গ্রাম দেখবার জন্য সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন আমাকে। এবাড়ী ওবাড়ী নিয়ে বসালেন, পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, ঢাকা থেকে

এসেছেন আমাদের খবরাখবর নিতে। দেখলাম, মুসলমান আর হিন্দু সবার কাছেই তাঁর সমান আদর। সবাই তাঁকে ভালোবাসে। বললেন, দেখলেন তো, এরা সব আমাদেরই লোক।

এত লোক আপনাদের। কিন্তু এত লোক থাকতেও এখানে আজ কৃষক সমিতির নাম গন্ধ নেই কেন? মুহূর্তের জন্য আত্মবিস্মৃতি ঘটল চাটিভাইয়ের। বিরক্তি ভরা কণ্ঠে বলে উঠলেন, হবে কি করে? কৃষক সমিতি কি আপনি গড়ে উঠবে। কেউ এগোতে চায় না সামনে, যত সব ভীরুর দল! কথার বেলা অনেকেই আছে, কিন্তু কাজের সময় কাউকে খুঁজে পাওয়া যায় না। চাটিভাই অস্ফুট কণ্ঠে গজ গজ করে চললেন। তবে কি আমাদের চির-আশাবাদী চাটিভাই এদের সম্পর্কে হতাশ হয়ে গেলেন? কথাটা যাচাই করে দেখবার জন্য বললাম, আপনি কি মনে করেন, এ সব লোকদের দিয়ে কোন কাজ হবে?

এবার চাটিভাইয়ের মুখে একটু উত্তেজনার আভাস লক্ষ্য করা গেল। একটু ঝাঁঝালো সুরে বলে উঠলেন, কেন হবে না? হবে না কেন? এরা কি কৃষক নয় যে কৃষক সমিতির কাজ করবে না? বলুন, আপনিই বলুন।

বলেই প্রশ্নের উত্তরের জন্য আমার মুখের দিকে তাকালেন। কি উত্তর দেব তাঁর এই প্রশ্নের? চুপ করে রইলাম।

এবার তিনি সুরটা একটু নরম করে টেনে টেনে বললেন, আমি কৃষক, আমি কৃষকের মন জানি। দুদিন আগে হোক আর পরে হোক কাজ ওরাই করবে। করতেই হবে। না করে উপায় আছে?

চাটিভাই আশ্চর্যরকম জীবন্ত আর মুখর। মুখ তাঁর অনর্গল চলছেই। যেখানেই কথা বলার সুযোগ পান, সেখানেই তাঁর

প্রচারকার্য চালিয়ে যান। সে ব্যাপারে স্থান কাল পাত্র বিবেচনার মাত্রা কিছুটা কম। এরই মধ্যে লক্ষ্য করছি, কিছু কিছু লোক তাঁকে এড়িয়ে চলতে চায়। যখন তাঁকে কথায় পেয়ে বসে, তখন তারা কোন একটা ছুতো দেখিয়ে কেটে পড়ে। আড়ালে গিয়ে হয়তো এই ক্ষ্যাপাটে লোকটার উদ্দেশ্যে হাসাহাসিও করে। আবার এমন লোকও আছে যারা মুগ্ধ হয়ে তাঁর কথা শোনে।

কেমন করে সংগঠন গড়ে তুলতে হয় সেই বিদ্যা তাঁর আয়ত্ত নেই। তাই সারা এলাকায় একাই তিনি কর্মী। কিন্তু সে জন্য ঘাবড়াবার পাত্র নন চাটিভাই। তিনি একাই একশো। হাটে মাঠে ঘাটে পাড়ায় আর মজলিসে যখন যেখানে যান, তাঁর মুখ অবিশ্রান্ত কাজ করে চলতে থাকে। কিন্তু এর ফলাফল কি হয় না হয় তা নিয়ে মাথা ঘামাবার মত সময় নেই তাঁর। তিনি সার কথাটা বুঝে নিয়েছেন—কাজ করলে তার ফল মিলবেই।

বিদ্যার পুঁজি বেশী নয় চাটিভাইয়ের। বলছিলেন, পাঠশালায় ক্লাস থ্রি পর্যন্ত পড়েছিলাম। গরীবের ঘরের ছেলে, পড়াশোনা ওইখানেই খতম। তারপর যা কিছু শিখেছি, সবই আমাদের কৃষক সমিতির দয়ায়। প্রথমে ইস্তাহার পড়তে শিখলাম। তারপর ক্রমে ক্রমে খবরের কাগজ পড়তে শুরু করলাম। এখন কিছু কিছু বই-পত্রও পড়তে পারি।

কিন্তু এখন নানা দিক দিয়েই অসুবিধা। সেই কৃষক আন্দোলনের যুগে দৈনিক সংবাদপত্র আর সাপ্তাহিক পত্রিকা চাটিভাইরা হাতের কাছেই পেতেন। কিন্তু এখন সারা গ্রামে একখানা কাগজও আসেনা। শহরের বন্ধুদের সঙ্গেও সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন। দেশে বিদেশে নিত্য নতুন যে সব ঘটনা ঘটে চলেছে, সে সব খবর কেমন করে তিনি রাখবেন। কিন্তু তাতেও হাল ছাড়েন না চাটিভাই। যে করেই

হোক, এদিক থেকে ওদিক থেকে সত্যে-মেথ্যায় মেশানো খবরাখবর কুড়িয়ে কাচিয়ে নিয়ে আসেন। তারপর অতীতের রাজনৈতিক শিক্ষা আর অভিজ্ঞতার কষ্টিপাথরে সেগুলিকে যাচাই করে, বিশ্লেষণ করে তিনি তাঁর চলার পথ নির্বাচন করেন। এই দুর্দিনে, এই জটিল পরিস্থিতির মাঝখানে শুধু তিনি কেন সকলের পক্ষেই চলার পথ খুঁজে বার করা কঠিন। কিন্তু তাই বলে তাঁর পথ চলা বন্ধ থাকে না।

পথ চলতে চলতে তাঁর মুখে কৃষক আন্দোলন, বিশেষ করে তেভাগা আন্দোলন সম্পর্কে নানা ঘটনার কথা জানলাম। কোন কোনটাতে তিনি নিজেই প্রত্যক্ষদর্শী বা অংশগ্রহকারী, আবার কতকগুলো তাঁর পরের মুখে শোনা কথা। দীর্ঘ বিশ বছর আগেকার কথা, অনেক কিছুই ভুলে গেছেন। কাহিনী হিসাবে সুশৃঙ্খলভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে বলবেন, সে সুযোগ নেই। কথা বলতে বলতে মাঝে মাঝে হঠাৎ দুটো একটা খণ্ডচিত্র স্মৃতির পথে ঝলসে ওঠে। সেগুলি যত্ন করে ধরে রাখবার মত। বেশ কিছু সময় নিয়ে তাঁর সঙ্গে থেকে তন্ন তন্ন করে আলাপ আলোচনা করলে পর সেই অলিখিত ইতিহাসের হারিয়ে যাওয়া কোন কোন মূল্যবান চিত্র হয়তো উদ্ধার করা যেত। কিন্তু তেমন অপর্যাপ্ত সময় কোথায়?

জীবনযাত্রার নানা ধান্দায় এত জোরে ছুটে চলি আমরা যে, পথের দুধারে যে সমস্ত মূল্যবান সম্পদ সঞ্চিত হয়ে আছে, তার অনেক কিছুই ফেলে যেতে হয়।

একটা জিনিস বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছি। গয়াবাড়ীর হরিকান্ত সরকারের প্রসঙ্গ উঠলেই উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন চাটিভাই। বলেন, এমন একটা লোক আর কোথাও দেখলাম না, দেখবও না

কোনদিন। আমাদের এই এলাকাটাকে তিনিই তো জাগিয়ে তুললেন।

বলতে বলতে তাঁর কণ্ঠস্বর নীচু আর গভীর হয়ে আসে। যেন অত্যন্ত রহস্যপূর্ণ আর গোপন একটা কথা কানে কানে বলছেন, এই ভাবে বলেন: জানেন, তিনিই প্রথম আমাকে এই পথ দেখিয়েছিলেন। তারপর আরও কতজনের কাছ থেকে রাজনীতির শিক্ষা পেয়েছি। কিন্তু প্রথম মন্ত্র নিয়েছিলাম তাঁর কাছেই, এ কথা আমি কোনদিন ভুলতে পারব না।

এইটুকু বলেই থেমে যান। যেন গভীর কৃতজ্ঞতায় তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে। একটু সময় নিঃশব্দে কেটে যায়।

কোথায় তিনি এখন? প্রশ্ন করি আমি।

আর কোথায়, ওই ওপারে।

চটিভাই সোজা উত্তর দিকে হাত বাড়িয়ে দেখান। অর্থাৎ দেশ ত্যাগ করে ভারতে চলে গেছেন।

বাঃ, আর সবাইকে পথে নামিয়ে দিয়ে শেষকালে তিনি নিজেই কেটে পড়লেন, বেশ মানুষ তো! ফস করে কথাটা বেরিয়ে যায় আমার মুখ থেকে। আমার এই কথার মধ্যে শ্লেষের ভাবটা মোটেই অস্পষ্ট ছিল না।

না, না, অমন করে বলবেন না, চাটিভাইয়ের চোখে মুখে তীক্ষ্ণ প্রতিবাদ ফুটে উঠল। আপনি কেমন করে জানবেন, কত দুঃখ পেয়ে তাঁকে দেশ ছেড়ে চলে যেতে হয়েছে। তিনি কি সহজে গেছেন? জানেন, যাবার সময় চোখের পানি ফেলতে ফেলতে চলে গেছেন। সে কথা কি কোনদিন ভুলতে পারব!

লজ্জা পেয়ে মাথা নীচু করলাম। সময় সময় ঝোঁকের মাথায় অবিবেচকের মত আমরা কত অসংগত কথাই না বলে ফেলি!

রাইটস্ সার্ভড্—চাটিভাইয়ের এই ধমকটা জায়গা মতই পড়েছে।

শুনেছি, ওপারে গিয়েও তিনি কাজ করে চলেছেন। চুপচাপ বসে নেই। এ মানুষ চুপ করে বসে থাকতে পারে না। আমার কি যে ইচ্ছা করে একবার তাঁকে দেখতে। এ জীবনে আর কোন-দিন বোধ হয় তাঁর সঙ্গে দেখা হবে না।

চাটিভাইয়ের মৃদু গুঞ্জন বিলাপের মতই শোনা গেল। একটা ম্লান, বিষণ্ণ আবহাওয়া থমথম করতে লাগল।

কথায় কথায় প্রসঙ্গটা বদলে নিয়ে অন্য কথায় চলে এলাম। বললাম, চাটিভাই, আপনাদের সেই আন্দোলনের সময় আপনারা গান গাইতেন না?

গান? কি যে বলেন, গান আবার গাইতাম না! হেসে উঠলেন চাটিভাই, সভায়, মিছিলে, চলতে ফিরতে সব সময় আমাদের মুখে মুখে গান থাকত। আরে বাপরে বাপ! সে কি গানের ঘটা! গানে গানে জমজমাট। গান না হলে কি কোন কাজ জমে।

দু'একখানা গান শোনাতে পারেন, যে সব গান আপনারা গাইতেন?

কেন পারব না? ষাট বছরের বৃদ্ধ যেন চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলে উঠলেন। বলেই আর দেরী নয়, সঙ্গে সঙ্গেই গলা ভাঁজতে শুরু করে দিলেন।

আপনাদের এখানকার লোকেরা গান বাঁধত না? জিজ্ঞাসা করলাম আমি।

বাঁধত না আবার, কত গান বাঁধত। একটা কিছু ঘটনা ঘটলেই হল, আর কি কথা আছে, সঙ্গে সঙ্গেই গান তৈরী হয়ে যেত।

কারা বাঁধত গান? তাদের নাম মনে আছে?

চাটিভাই একটু চিন্তা করে বললেন, গাভরণের রাজেন্দ্র সাধু গান বাঁধত। গয়াবাড়ীর বিপিন বর্মণ গান বাঁধত। আরও দু'একজন গান বাঁধত, তাদের নাম এখন মনে পড়ছে না।

সেই তাদের বাঁধা গানই আমি শুনতে চাই।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই গানই তো গাইছি।

চাটিভাইয়ের আর দেরী সয় না, গান ধরে দিলেন।

দিনের শোভা সুরুজ ভাইরে
আইতের শোভা চান্দ
হালুয়ার শোভা হাল কৃষি,
জমিনের শোভা ধান।
ও কৃষক হও আগুয়ান
ছল করিয়া লইয়া যায়
তোমার দেশের আমন ধান।
চাষার অক্ত পানি করিরে
দেশে হইল সোনার ধান,
সেও ধান লইয়া যায় তোমার
দুষ্ট গবর্নমেন্ট।

গান শেষ করে চাটিভাই ব্যাখ্যা বুঝিয়ে দিলেন—পঞ্চাশ সালের দুর্ভিক্ষের সময় এই গানটা বাঁধা হয়েছিল।

কে বেঁধেছিলে এই গান?

দাঁড়ান, দাঁড়ান, মনে করছি। হাঁ, হাঁ, মনে পড়েছে—বিপিন। আমাদের বিপিন, গয়াবাড়ীর বিপিন বর্মণ এই গানটা বেঁধেছিল।

এই বয়সেও গলাটা দরাজ আছে চাটিভাইয়ের। তবে মাঝে মাঝে বেসুরো হয়ে যায়। তা যাক, উৎসাহের প্রাচুর্যে ও সমস্ত ত্রুটি চাপা পড়ে যায়।

গানের আওয়াজ শুনতে পেয়ে একজন দু'জন করে বেশ কয়েকজন লোক এসেছিল। তাদের মধ্য থেকে একজন তারিফ করে বলল, বাহা, বাহা। আর একজন বলে উঠল, ওই গানটা, ওই গানটা চালাও চাটিদা। শুনিয়ে দাও ওঁকে।

কোন গানটা রে?

আহা, সেই যে—কোন দেশে নাড়িয়া কাইয়ারে।

ঠিক ঠিক, ওইটাই হোক। অনেক দিন তোমার মুখে ওই গানটা শুনি না।

অক্লান্ত কর্মী চাটিভাই কালবিলম্ব না করে শুরু করে দিলেন।

বিকান থাকি আলুরে কাইয়া
হাতে লইয়া ঘটি,
আস্তে আস্তে নিলুরে কাইয়া
মোদের দেশের মাটি।
কোন দেশের নাড়িয়া কাইয়া রে।
মোরে দেশে আ'লু রে কাইয়া,
মোরে মাটি নিলু,
পেটের ভোখে তেভাগা চাইতে
মাথাতে ডাঙ্গালু।
কোন দেশের নাড়িয়া কাইয়া রে।
কাইয়া কান্দে, কাইয়ানী কান্দে,
কান্দে কাইয়ার মাও
মণি সেনের মাথায় ডাঙ্গেয়া
কি করিস উপায়।
কাইয়া কান্দেরে।

গানটা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই শ্রোতারা উল্লাসধ্বনিতে ফেটে

পড়ল। গানটা শুনে কৌতূহলী হয়ে উঠলাম। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে তেভাগা আন্দোলনের কোন একটি ঘটনা নিয়ে গানটি বাঁধা হয়েছে। গানের শেষভাগে মণি সেনের উপর আক্রমণের উল্লেখ আছে। এই মণি সেন সম্ভবত রংপুরের তেভাগা আন্দোলনের অন্যতম নেতা মণিকৃষ্ণ সেন হবেন।

চাটিভাইয়ের কাছে কাহিনীটা শুনলাম। চাটিভাই নিজেই সে সময় ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন।

ঘটনাটা ঘটেছিল ডিমলা থানার নাওতাড়া গ্রামে। 'বিকান থাকি' অর্থাৎ বিকানীর থেকে কোড়ামল দাগা নামে জনৈক মাড়োয়ারী ব্যবসা করতে এসে ক্রমে ক্রমে জোতদার হয়ে বসল। কোড়ামল রংপুরের বড় জোতদারদের মধ্যে একজন। তেভাগা আন্দোলন তখন জোরে সোরে শুরু হয়ে গিয়েছে। কৃষক সমিতির নেতৃত্বে আধিয়ার চাষীরা কোড়ামল দাগার জমিতে দলবদ্ধভাবে ধান কেটে তাদের নিজ নিজ খোলানে নিয়ে তুলল। ধান কাটার সময় এক দল চাষী ধান কাটছিল আর এক দল লাঠিধারী ভলান্টিয়ার তাদের পাহারা দিচ্ছিল। তেভাগার সংগ্রামের সময় এইভাবেই ধান কাটা হ'ত।

পরদিন একটা খবর পাওয়া গেল, পাশেই অন্য একটা গ্রামে একজন আধিয়ার চাষী কারো সঙ্গে কোন পরামর্শ না করে তার নিজের ক্ষেতে ধান কাটতে নেমে গেছে। ব্যাপারটায় বিপদের আশঙ্কা ছিল। জোতদার যদি জানতে পারে যে কোন আধিয়ার চাষী অরক্ষিত অবস্থায় তার ক্ষেতের ধান কাটতে নেমে গেছে, তাহলে সে সেই কাটা ধান জোর করে তার নিজের খোলানে নিয়ে তুলবে। সেদিন ধান কাটার কথা ছিল না। ভলান্টিয়াররা কে কোথায় আছে, তার ঠিক নেই। তাই ওর ধান কাটাটা আজকের

মত বন্ধ রাখতেই হবে। মণিদা অর্থাৎ মণিকৃষ্ণ সেন কাছেই ছিলেন। তিনি নিজেই গেলেন তাকে বুঝ মানিয়ে ক্ষান্ত করবার জন্য।

একাই গেলেন তিনি? আমি প্রশ্ন করলাম।

চাটিভাই উত্তর দিলেন, না না, একা যাবেন কেন, আমরা কয়েকজন তাঁর সঙ্গে গেলাম। এক মণিদা ছাড়া আমাদের সবার হাতেই লাঠি। কিন্তু আমাদের মধ্যে কেউ পাকা ভলান্টিয়ার নয়, আমরা কোনদিন ভলান্টিয়ারের ট্রেনিং নেইনি। মণিদা কিছুটা এগিয়ে গিয়েছিলেন, আমরা ছিলাম পিছনে। মণিদা যেই মাত্র ক্ষেতের কাছে গিয়ে সেই চাষীর সঙ্গে কথা বলতে শুরু করেছেন, অমনি হঠাৎ কোথা থেকে জোতদার কোড়ামল দাগার চার পাঁচ জন পাইক লাটিসোঁটা নিয়ে ছুটতে ছুটতে এসে হাজির। তাদের একজনের হাতে বন্দুক। ওরা এসেই মণিদাকে ঘিরে ফেলল। আমরা এগোতে পারি না, বন্দুকধারী লোকটা আমাদের দিকে বন্দুক তাক করে দাঁড়িয়ে আছে।

সে যে কী অবস্থা! আমরা কেমন যেন হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে রইলাম। কি করব বুঝে উঠতে না পেরে শুধু চেঁচাতে লাগলাম। ওদিকে মণিদার হাতে একটা লাঠি পর্যন্ত নেই। একটা গাছের নীচে দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি। এর মধ্যেই সেই গাছের একটা ডাল ভেঙ্গে নিয়ে তিনি ওদের আঘাত ঠেকাবার জন্য তৈরি হয়ে দাঁড়িয়েছেন। দুটো একটা ঘা তিনি সামলে নিলেন। কিন্তু এ ভাবে কতক্ষণ ওদের ঠেকিয়ে রাখবেন! ওদের একজন ঘুরে পিছন দিকে গিয়ে মণিদার মাথার উপর লাঠি চালাল। সেই ঘা খেয়ে উপুড় হয়ে পড়ে গেলেন মণিদা। রক্তে মাটি ভেসে গেল। ইতিমধ্যে আমাদের চ্যাঁচামেচি শুনে অনেক লোক এসে জমেছে।

মণিদাকে পড়ে যেতে দেখে আমাদেরও তখন আর ভয়টয় ছিল না। মরিয়া হয়ে আমরা সবাই ঝাঁপিয়ে পড়লাম ওদের উপর। এত লোক দেখে ওরা ঘাবড়ে গিয়েছিল। বন্দুক গুটিয়ে নিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালাল।

তারপর আর বলেন কেন? আমাদের মণিদার গায়ে হাত দিয়েছে ওরা, আর কি কথা আছে। মানুষ ক্ষেপে আগুন হয়ে উঠল। কোড়ামলের ভুঁড়ি ফাঁসিয়ে দিতে হবে, সকলের মুখে এই এক কথা। অবস্থা বেগতিক দেখে জোতদার কোড়ামল একদিন রাত্রির অন্ধকারে ঘর ছেড়ে পালাল। সেই কথাটাই তো গানের মধ্যে বলেছে।

কাইয়া কান্দে, কাইয়ানী কান্দে,
কান্দে কাইয়ার মাও
মণি সেনের মাথায় ডাঙ্গেয়া
কি করিস উপায়।
কাইয়া কান্দেরে।

বাঃ, বেশ বেঁধেছিল তো গানখানা, বললাম আমি, কে বেঁধেছিল গানটা? তার নাম কি?

চাটিভাই অনেক ভেবেও তার নামটা মনে করতে পারলেন না।

এত বড় একটা ঘটনা কিন্তু চাটিভাইয়ের মনেই ছিল না বলতে। গানের মধ্য দিয়ে কোড়ামল দাগার কাহিনীটা বেরিয়ে এল।

এবার বিদায়ের পালা। মাত্র দু'দিনের পরিচয়। কিন্তু এর মধ্যেই কি নিবিড় আকর্ষণ অনুভব করছি। দু'দিন আগেও যাকে চিনতাম না, জানতাম না, সে কেমন করে এমন পরমাত্মীয় হয়ে দাঁড়াল। বললাম, যাচ্ছি চাটিভাই। কে জানে হয়তো আর কোন দিন দেখা হবে কিনা।

কেন হবে না? নিশ্চয় হবে, দৃঢ় কণ্ঠে প্রতিবাদ জানালেন চাটিভাই। দেখা হবেই, এ বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ।

বললেন, ঢাকার বন্ধুদের বলবেন, আমরা ঠিক আছি।

সবাই কি ঠিক আছে চাটিভাই? একটু হেসে প্রশ্ন করলাম।

আহা, যদি কিছু বে-ঠিক হয়ে থাকেই, ঠিক কি আর হবে না? ঠিক করে তুলতেই হবে যে।

বিদায় মুহূর্তে চাটিভাই আর একবার চমকে দিলেন। ঘরে কয়েকজন লোক ছিল। আমাকে তাদের কাছ থেকে আলাদা করে ডেকে নিয়ে একটু নীচু স্বরে বললেন, আচ্ছা দাদা, আপনারা তো আমাদের চেয়ে অনেক বেশী জানেন, অনেক বেশী বোঝেন। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি আপনাকে।

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকালাম।

আমরা যা চেয়ে আসছি, যার জন্য আমরা সংগ্রাম করে চলেছি, আমরা এ জীবনে তা দেখে যেতে পারব তো?

এর উত্তরে কি বলা যায়, তা আমার জানা নেই। তাঁকে খুশী করবার জন্য আশ্বাস দিয়ে আসতে পারতাম। কিন্তু তাঁর কাছে মনগড়া কথা বানিয়ে বলতে ইচ্ছা করল না। কোন কথা না বলে আমি নিঃশব্দে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। তা থেকে তিনি কি বুঝলেন তা জানি না। তবে একটু ম্লান হাসি হেসে বললেন, বেশ তো, নাই বা দেখলাম। কিন্তু আমরা সকলের মুক্তির জন্য সংগ্রাম করে চলেছি। নিজের সুখের জন্য অন্যায়ের কাছে আত্মসমর্পণ করিনি। মরবার সময় এই আনন্দটুকু তো থাকবে, কি বলেন দাদা?

চাঠিভাইয়ের মুখ থেকে যে এমন একটা কথা বেরিয়ে আসতে পারে, এ আমি কল্পনাও করতে পারিনি। শেষ মুহূর্তে নতুন করে

তার একটা পরিচয় পেয়ে গেলাম। ভিমলায় আসা সার্থক হয়েছে আমার। ইচ্ছা করছে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরি চাটিভাইকে। কিন্তু মনের ইচ্ছা মনেই চেপে রেখে তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে পড়লাম। এক অদ্ভুত অনাস্বাদিত রসে মনটা আমার পূর্ণ হয়ে উঠেছে।

চাটিভাই হাত তুলে বিদায় সম্ভাষণ জানালেন। প্রত্যুত্তরে আমিও হাত তুললাম।

দুনিয়ার মজুর চাষী এক হও

□ □ □ □ □ □ □

১৯৪৬ সাল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ডামাডোল কেটে গেছে; কিন্তু তার জের এখনও কাটেনি। কাটা দূরে থাক, বরঞ্চ তার বিষাক্ত প্রতিক্রিয়া পারার মত জাতির সর্বাঙ্গ দিয়ে দগদগে ঘা হয়ে বেরোচ্ছে।

সারা বাংলাদেশ জুড়ে রেলশ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। যুদ্ধের মধ্য দিয়ে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দর বেড়ে গেছে দ্বিগুণ, তিনগুণ, চতুর্গুণ। শ্রমিকরা মাগ্গী ভাতা বাবদ যা পায়, তাতে এই অগ্নিমূল্যের মোকাবিলা করা কোনমতেই সম্ভব হয় না। তারা অভাবের তাড়নায় দিশাহারা, বাঁচবার পথ খুঁজে পায় না। এই দুরবস্থার প্রতিকারের জন্য রেল কর্তৃপক্ষের কাছে বহু আবেদন নিবেদন করা হয়েছে, কিন্তু কোন সাড়া পাওয়া যায়নি। নীচের তলার বুভুক্ষুদের কান্নাকাটি উপর তলার প্রভুদের সুখনিদ্রার ব্যাঘাত ঘটাতে পারে না। নিরুপায় রেল শ্রমিক আর কোন পথ না পেয়ে ধর্মঘট করার কথা ভাবছে।

কিন্তু রেলের ধর্মঘট কথার কথা নয়। ধর্মঘটের আভাস পেয়ে

উপরতলার প্রভুদের টনক নড়ল। এবার আর নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকতে পারলেন না তারা। ঘোষণা করলেন, রেল-ধর্মঘট হলে সমস্ত জাতির স্বার্থ বিপন্ন হবে। কাজেই সরকার কিছুতেই এই ধর্মঘট বরদাস্ত করতে পারেন না।

এ বিষয়ে সন্দেহ নেই, সরকার এই ধর্মঘটকে বানচাল করে দেবার জন্য চেষ্টার কোন ত্রুটি করবেন না। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা রেলশ্রমিকদের সত্যিকারের সংগঠন সবেমাত্র গড়ে উঠছে। তার বুনিয়াদ এখনও কাঁচা। আন্দোলন কোথাও কোথাও দানা বেঁধে উঠছে, আবার কোথাও তা প্রাথমিক পর্যায় কাটিয়ে উঠতে পারেনি। এক এক জায়গায় এক এক রকম অবস্থা। শ্রমিকরা তাদের ইউনিয়নকে সমর্থন করে, ভালবাসে, কিন্তু সারা প্রদেশের সর্বত্র শাখা-ইউনিয়নগুলি সমান জোরদার নয়। তারপর সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত দালাল ইউনিয়নও শ্রমিকদের মধ্যে বিভ্রান্তি ও আতংকের সৃষ্টি করে চলেছে।

ধর্মঘট সম্পর্কে সকলের মতামত যাচাই করে দেখবার জন্য লালমণিরহাটে রেল-শ্রমিকদের এক আঞ্চলিক সম্মেলন ডাকা হল। লালমণিরহাট উত্তরবঙ্গের একটা গুরুত্বপূর্ণ জংশন। এই অঞ্চলের শ্রমিকরা কি করবে না করবে, তার উপর উত্তর-বঙ্গের ধর্মঘটের সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করে। সেইজন্য এই সম্মেলনের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছিল।

সেই সময়টায় রংপুর, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, মালদহ ও পাবনার অংশবিশেষে বর্গাচাষীদের তেভাগার সংগ্রাম পূর্ণগতিতে চলছে। উত্তরবঙ্গের এই সমস্ত আধিয়ার চাষী, যারা যুগ যুগ ধরে জোতদারদের হাতে শোষিত হয়ে আসছিল, এই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তাদের বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটছিল। সেদিন তেভাগার সেই

রণাঙ্গনে তারা যে সংগ্রামী ইতিহাস রচনা করে তুলছিল, তা আমাদের দেশের কৃষকসমাজের কাছে গৌরবময় ঐতিহ্য হয়ে আছে।

সম্মেলনের দিন এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখা গেল। কত জায়গায় কত শ্রমিক সম্মেলন হয়ে আসছে, কিন্তু ইতিপূর্বে আর কোন শ্রমিক সম্মেলনে দৃশ্য দেখা গেছে কিনা সন্দেহ। রেল-শ্রমিকেরা অবাক হয়ে দেখল, গ্রামাঞ্চল থেকে কৃষকেরা দলে দলে লালঝাণ্ডা নিয়ে মিছিল করে এগিয়ে আসছে। তারা আওয়াজ তুলছে, "রেল-শ্রমিকদের দাবি মানতে হবে", "দুনিয়ার মজুর চাষী এক হও"। শ্রমিকেরা এতক্ষণ তাদের নিজস্ব দাবি-দাওয়া নিয়ে আওয়াজ তুলছিল। সচেতন কৃষকদের আহ্বানে অনুপ্রাণিত হয়ে তারাও সাড়া দিল "তেভাগার দাবি মানতে হবে", "দুনিয়ার মজুর-চাষী এক হও।"

লালমণিরহাটের চারদিককার গ্রামগুলিতে কৃষক সমিতি সে সময় জালের মত ছড়িয়ে ছিল। শ্রমিকদের সংগ্রামের মুখে তারা তাদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে চলে এসেছে। তাদের উৎসাহ দেখে মনে হচ্ছিল, এ যেন তাদের নিজেদের সম্মেলন। শ্রমিক সম্মেলনের স্থান পূর্ণ করে তুলল শ্রমিকেরা নয়, কৃষকেরা। সম্মেলনে পাঁচ হাজার রেল শ্রমিক যোগ দিয়েছিল, অপর পক্ষে কৃষকদের সংখ্যা ছিল পনেরো হাজার। সমস্ত অঞ্চল জুড়ে বিপুলভাবে সাড়া পড়ে গেল। ওখানকার পুরানো লোকেরা এখনও সে কথা ভুলে যায় নি, এখনও তারা বলাবলি করে, লালমণিরহাটে এত বড় সভা আর কোনদিন হয়নি।

গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলন। ধর্মঘট সম্পর্কে এই অঞ্চলের সাধারণ শ্রমিকদের মনোভাব কি, এই সম্মেলনের মধ্য দিয়ে তার পরিচয় পাওয়া যাবে। সংগ্রামী চেতনার দিক দিয়ে সকল অঞ্চলের রেল

শ্রমিক এক স্তরে নেই। কোথাও অবিলম্বে ধর্মঘটে ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছে, তাদের সামলে রাখা কঠিন। কোথাও বা ভয়ে এগোতে চায় না। এখানকার রেল-শ্রমিকদের মধ্যে প্রায় সবাই বিহারী। এরা দেশ ছেড়ে এখানে এসেছে, বিপদে-আপদে দাঁড়াবার জায়গা নেই। তাই ধর্মঘটের কথা উঠলে এরা এক পা এগোয় তো দু পা পিছোয়। এই সম্মেলনে এদের আখেরী সিদ্ধান্তটা জানা যাবে।

সম্মেলনের কাজ শুরু হয়ে গেল। প্রথমে একজন শ্রমিকনেতা ধর্মঘটের পক্ষে বক্তৃতা দিলেন। কিন্তু মিনিট পনেরো কুড়ি বক্তৃতা দেবার পরেও দেখা গেল শ্রোতারা নিশ্চল পাথরের মত, কোন সাড়া শব্দ নেই।

এই অচল অবস্থাটা ভেঙ্গে ফেলবার জন্য এবার একজন নামজাদা বক্তা উঠে দাঁড়ালেন। বহুলোকের হাততালির মধ্য দিয়ে তিনি বলতে শুরু করলেন। তিনি কথার যাদুকর, লোকে বলে তাঁর বক্তৃতা শুনলে মরা মানুষও নাকি জেগে ওঠে। লক্ষ্য করা গেল তাঁর বক্তৃতার তোড়ে পাঁচ হাজার শ্রমিক ও জনতা আন্দোলিত হয়ে উঠেছে। তাদের চোখমুখের ভাব বদলে গেছে। ঘন ঘন হাততালি পড়তে লাগল। সভা জমে গেছে। সম্মেলনের উদ্যোক্তারা উৎসাহিত হয়ে উঠলেন।

বক্তৃতা শেষ করে বক্তা এবার শ্রমিকদের উদ্দেশ করে প্রশ্ন করলেন, তা হলে আপনারা সবাই এই ধর্মঘটে সামিল হতে প্রস্তুত আছেন তো? কেউ কোন উত্তর দিল না। শুধু একটা অস্ফুট গুঞ্জনের শব্দ শোনা গেল। জোর গলায় বলুন। বলুন, হ্যাঁ কি না।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ, পাঁচ হাজার শ্রমিকের মধ্যে এদিকে ওদিকে অল্প কয়েকটি কণ্ঠস্বর শোনা গেল। বাদবাকী সব চুপ। বক্তা হতাশ

দৃষ্টিতে তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। নিঃশব্দতার মধ্য দিয়ে ওরা ওদের রায় স্পষ্টভাবেই জানিয়ে দিয়েছে।

এই অবস্থায় করনীয় কি? নেতারা মঞ্চের উপর এই নিয়ে কানাকানি করতে লাগলেন।

এই সময় কৃষকদের মধ্য থেকে একজন বিশিষ্ট কৃষক নেতা উঠে দাঁড়িয়ে বলতে শুরু করলেন:

আমি কিছু বলতে চাই। আমরা জানি, আপনারা সবাই ধর্মঘটের পক্ষে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আপনারা ধর্মঘটে যোগ দিতে ইতস্তত করছেন। তার কারণটাও আমরা জানি। আপনারা বাংলার বাইরের লোক, এখানে আপনাদের এমন কোন আত্মীয়-স্বজন বা বন্ধুবান্ধব নেই যারা ধর্মঘট চলার সময় আপনাদের আশ্রয় দিতে পারে বা কোন রকম সাহায্য করতে পারে। ধর্মঘটের সময় আপনাদের খাওয়া-দাওয়া কেমন করে চলবে, এই নিয়েই তো আপনাদের দুশ্চিন্তা? আপনারা বলুন, আমি ঠিক বলছি কি না।

একেবারে সার কথাটাই বলে দিয়েছেন, শ্রমিকদের পক্ষ থেকে একজন উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আমরা বাইরের মানুষ, এখানে আমাদের কোথাও দাঁড়াবার জায়গা নেই। তাই পদে পদেই আমাদের ভয়। মনে মনে আমরা সবাই ধর্মঘটের পক্ষে।

এবার আরও কয়েকজন শ্রমিক একসঙ্গে তার কথার সমর্থন সূচক কলরব করে উঠল।

আপনাদের কাছে এবার আমার একটি প্রশ্ন—যতদিন ধর্মঘট চলবে ততদিন আপনাদের খাওয়া দাওয়ার সম্পূর্ণ ভার যদি আমরা নিই, তাহলে আপনারা ধর্মঘটে সামিল হতে রাজী আছেন তো?

এর উত্তরে সেই শ্রমিকটি আবার উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, তা হলে তো কোন কথাই নেই। আমরা সবাই ধর্মঘটের পক্ষে।

কিন্তু এ তো দু'চার জন লোকের কথা নয়, এত লোকের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা কি করে করা যাবে? আমাদের রিজার্ভ ফাণ্ডে যা জমা আছে, তা তো নিতান্ত যৎসামান্য। তাই বলছি, এ কি করে সম্ভব হবে?

সম্ভব, আমি বলছি সম্ভব। কি করে সম্ভব তাও বলছি। বলেই শ্রমিকদের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে তিনি কৃষকদের উদ্দেশ্য করে বললেন, কৃষক ভাইসব, আমি আপনাদের পক্ষ থেকে শ্রমিক ভাইদের এই ওয়াদা দিচ্ছি যে, রেল ধর্মঘট যতদিন চলবে ততদিন আমরা আমাদের ধর্মঘটী শ্রমিক ভাইদের ডালভাত যুগিয়ে চলব। বলুন, আপনারা এই ওয়াদা রক্ষা করে চলতে প্রস্তুত আছেন তো?

এক মুহূর্ত দেরী নয়, হাজার হাজার কৃষকের কণ্ঠে আওয়াজ উঠল,—প্রস্তুত, প্রস্তুত। একজন কৃষক উঠে দাঁড়িয়ে বলল, যতদিন তারা নিজেরা খেতে পাবে ততদিন ধর্মঘটী শ্রমিক ভাইদের খাওয়ার অভাব হবে না।

এবার কৃষক ও মজুরের মিলিত কণ্ঠের আওয়াজ উঠল—দুনিয়ার মজুর চাষী এক হও। সম্মেলন সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। সম্মেলনে উপস্থিত পাঁচ হাজার রেল শ্রমিক ধর্মঘটে সামিল হবার জন্য সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল।

ঠিক এই সময় এরই পাশাপাশি আরও একটি ঘটনাস্রোত বয়ে চলছিল। সে সম্পর্কে উল্লেখ না করলে এই কাহিনীর অঙ্গহানি ঘটবে।

এ খবর কোন খবরের কাগজে প্রকাশিত হয়নি। দেশবিদেশের গুরুত্বপূর্ণ সংবাদমালার মধ্যে এই সমস্ত তুচ্ছ সংবাদ স্থান পাবার যোগ্য বলে বিবেচিত হয় না। আমাদের এই গরীব দেশের খবরের

কাগজে গরীবদের রুটি-রুজির সংগ্রামের কটা খবরই বা প্রকাশিত হয়ে থাকে।

উত্তরবঙ্গের জেলায় জেলায় আধিয়ার চাষীদের তেভাগার সংগ্রাম চলছিল। সেই সংগ্রামের আওয়াজ সারা বাংলার সংগ্রামী জনতার মনে প্রতিধ্বনি জাগিয়ে তুলছিল। বি. ডি. আর. লাইন অর্থাৎ বেঙ্গল ডুয়ার্স রেলওয়ের জনকয়েক জঙ্গী কর্মী উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠল। তারা সংকল্প নিল যে, তারা কৃষকদের এই সংগ্রামে তাদের সঙ্গে হাত মিলাবে। এরা স্বনামধন্য কেউ নয়, এদের নাম বললে কেউ চিনবে না। তা ছাড়া তাদের নামও আমার জানা নেই।

তারা কৃষকের এই সংগ্রামে তাদের সঙ্গে হাত মেলাবে। কিন্তু কেমন করে? সারাদিন ওরা নিজেদের কাজ নিয়েই ব্যস্ত, সময় কোথায়? তা ছাড়া প্রকাশ্যে এসব কাজ করলে চাকরী কি আর থাকবে! তাই রাত্রির অন্ধকারে নিশাচরের মত ওরা ওদের কাজ শুরু করে দিল। জলপাইগুড়ির যে সমস্ত অঞ্চল অন্যান্য জায়গা থেকে বিচ্ছিন্ন, যেখানে কোন কৃষক সংগঠনের নামগন্ধ নেই, তারই একটা এলাকা তারা তাদের কর্মক্ষেত্র হিসেবে বেছে নিল।

ওরা রাত্রির অন্ধকারে সেই এলাকায় ট্রেন থেকে টুপ করে নেমে পড়ত, তারপর পাড়ায় পাড়ায় গিয়ে গরীব আধিয়ার চাষীদের নিয়ে বৈঠক-সভায় তারা উত্তরবঙ্গের আধিয়ার চাষীদের তেভাগার সংগ্রামের কাহিনী শোনাত। একদিন, দুদিন, তিনদিন—দেখতে দেখতে সেই এলাকা জেগে উঠল। তেভাগার অন্যান্য অঞ্চলের মত এখানেও গড়ে উঠল লাঠিধারী ভলান্টিয়ার বাহিনী। খবর পেয়ে জোতদাররা আতঙ্কিত হয়ে উঠল। এমন বিচ্ছিন্ন আর নির্ঝঞ্ঝাট এই দেশে কারা আবার বাইরে থেকে এসে এই চাষীগুলোকে উস্‌কানি দিয়ে ক্ষেপিয়ে তুলল। কিন্তু অনেক

চেষ্টা করেও সেই উস্কানিদাতা শয়তানগুলোর পাত্তা পাওয়া গেল না।

বি. ডি. আর.-এর একটা ট্রেন মাঝে মাঝে যে সব জায়গায় দাঁড়াবার কথা নয়, বিনা কারণে তেমন সব জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ত। প্যাসেঞ্জাররা এমন জায়গায় গাড়ী থামবার কারণ বুঝতে না পেরে অবাক হয়ে যেত। সমস্ত ব্যাপারটা তাদের কাছে কেমন যেন রহস্যজনক বলে মনে হত। ট্রেনটা যেখানেই দাঁড়াত, সেখানেই দেখা যেত লাইনের কাছে ধান ক্ষেতের মধ্যে বহু চাষী সারি বেঁধে ধান কেটে চলেছে। ক্ষেতের চারদিকে লাঠিধারী ভলান্টিয়াররা পাহারা দিচ্ছে। একধারে একটা লাল ঝাণ্ডা উড়ছে। তেভাগার সংগ্রামের সময় এ দৃশ্য নতুন কিছু নয়, অনেকেরই দেখা আছে। কিন্তু আশ্চর্য কথা, ট্রেনটা এসে দাঁড়াতেই চাষীরা তাদের হাতের কাজ রেখে ট্রেনটার দিকে তাকিয়ে আওয়াজ তুলল—ছুনিয়ার মজুর চাষী এক হও! আরও আশ্চর্য, এই আওয়াজ উঠবার সঙ্গে সঙ্গেই ইঞ্জিনের বাঁশীটা ঘন ঘন বাজতে থাকত, যেন তাদের ডাকে সাড়া দিচ্ছে।

প্যাসেঞ্জাররা একটা জিনিস হয়তো লক্ষ্য করতে পারেনি, ইঞ্জিনের সাহেব ড্রাইভার সেই চাষীদের দিকে তাকিয়ে ঘন ঘন হাত নাড়তেন। ড্রাইভারটি জাতে আইরিশম্যান। ছুনিয়ার মজুর চাষী এক হও—এই আওয়াজের সার্থকতা তিনিও মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন।

স্পষ্টরাম আর জয়মণি

□ □ □ □ □

দরিদ্র কৃষক দম্পতি। স্পষ্টরাম সিং আর জয়মণি বর্মণী। মাত্র চার বিঘা জমি ওদের সম্বল। এই জমিটুকু আর কিছু বর্গা জমি চাষ করে ওদের ছোট্ট সংসারটি চলছে।

প্রাচুর্যের মুখ ওরা কোনদিনই দেখেনি। সে স্বপ্নও তাদের ছিল না। উত্তরবঙ্গের আধিয়ার চাষীদের জীবনের সবচেয়ে বড় সমস্যা দেহ আর প্রাণটাকে কোনমতে টেনে টেনে একত্র করে রাখা। তাদের মত গরীব চাষী সারা বাংলায় আর কোথাও ছিল না। মাত্র এক হাঁটু পানির মধ্য দিয়ে হলেও স্পষ্টরাম আর জয়মণি ওদের ছোট্ট সংসার তরণীটিকে টেনে নিয়ে চলেছিল। অভাব থাকলেও অভাবের দুঃখটাকে ওরা তেমন গায়ে মাখত না। কিন্তু ওদের ভাই বন্ধু প্রতিবেশী—সাধারণ চাষীদের সীমাহীন দুঃখ দুর্দশা আর ব্যথা বেদনা ওদের মনে কি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করত, সে কথা আমার জানা নেই। হয়তো, দেখতে দেখতে তাদের গা-সওয়া হয়ে উঠেছিল, হয়তো আর দশজনের মত তারাও একে অদৃষ্টের অলঙ্ঘ্য বিধান বলে মেনে নিয়েছিল।

কিন্তু কিছুদিন থেকে বাতাসটা কেমন যেন চঞ্চল হয়ে উঠছে। জয়মণি লক্ষ্য করল তার শান্ত আর সুস্থির স্বামী স্পষ্টরাম একটু একটু করে অশান্ত হয়ে উঠছে। তার চলাফেরা আর কথাবার্তার ধরন-ধারণ ক্রমশই বদলে যাচ্ছে। কি হল তার! তার চোখের চাউনিটাও যেন সে রকম নেই, মাঝে মাঝে কথায় কথায় বিদ্যুতের মত ঝিলিক মেরে ওঠে। আগের চেয়ে কথা বলে কম, মাঝে মাঝে চুপ করে নিজের মনে কি যেন ভাবে। এ আবার কি! জয়মণির ধারণা ছিল স্পষ্টরাম তার কাছে দিবালোকের মতই স্পষ্ট, কিন্তু এখন দেখছে সে দিন দিনই অস্পষ্ট আর ঝাপসা হয়ে আসছে।

আজকাল স্পষ্টরামের ঘরে ফিরতে প্রায়ই অনেক রাত হয়ে যায়। দেরী হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করলে একথা ওকথা বলে এড়িয়ে যায়। জয়মণি চালাক মেয়ে, এই ফাঁকিটুকু বুঝতে তার বাকী থাকে না। কিন্তু কেন? এ কথার কোন উত্তর সে খুঁজে পায় না। অন্য কোন পুরুষ হলে তার চরিত্র সম্পর্কে সন্দেহ জাগত। কিন্তু স্পষ্টরামের সম্পর্কে এমন কথা ভাবতেই পারেনা জয়মণি। কিছুদিন থেকে আরও একটা জিনিস তার নজরে পড়ছে। মাঝে মাঝে দু'একজন ভদ্রলোকের ছেলে এসে স্পষ্টরামের সঙ্গে নিরিবিলি বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে কত কি কথা বলে। কখনও কখনও তাদের সঙ্গে কোথায় যেন চলে যায় স্পষ্টরাম। ওদের দেখে মনে হয় কোন জোতদারের ঘরের ছেলে হবে। কিন্তু জোতদারের ঘরের ছেলেরা তো চাষীদের সঙ্গে এমন করে মেশে না। কৌতূহলে ছটফট করতে থাকে জয়মণি, আবার কেমন যেন ভয় ভয়ও করে। কি এত গোপন পরামর্শ এদের?

কিছুকাল বাদে আর কোন কিছুই গোপন থাকে না। পাড়ায় পাড়ায় বৈঠক চলছে। শহর থেকে কৃষক সমিতির নেতারা আর

কর্মীরা সেই বৈঠকে এসে বক্তৃতা দেন, সবাইকে বোঝান, জোতদারদের অত্যাচার থেকে বাঁচতে হলে কৃষকদের নিয়ে কৃষক সমিতি গড়ে তুলতে হবে। তা না হলে বাঁচবার কোন উপায় নেই। এসব বৈঠকে মেয়েদের কেউ ডাকে না। নাই বা ডাকল, জয়মণি কখনও আড়ালে, কখনও বা একপাশে দাঁড়িয়ে সেই সব কথা শোনে। শুনতে শুনতে অনুপ্রাণিত হয়ে ওঠে। তাদের ঘরের কথা, তাদেরই দুঃখ দুর্দশার কথা এই সব বাবুরা কি সুন্দর করেই না বলেন, এসব কথা এমন করে নিজে তো সে কোনদিন ভেবে দেখেনি। রাত্রিবেলা স্পষ্টরামের পাশে শুয়ে বিনিদ্র নয়নে এই সমস্ত কথাই সে ভাবে। পাশাপাশি দুজন, যে যার চিন্তায় বিভোর, কেউ কারু মনের কথা টের পায় না।

স্পষ্টরামের বাড়ী বালিয়াডাঙ্গা থানার অন্তর্গত দক্ষিণ পারিয়া গ্রাম। তাদের ইউনিয়নের নাম ৫নং আমজানখোর ইউনিয়ন। এইখান থেকেই তার কাজ শুরু। কিন্তু বেশী দিন এই ইউনিয়নের কাজের মধ্যে আটকে থাকা তার পক্ষে সম্ভব হলো না। স্পষ্টরাম অতি অল্প দিনের মধ্যেই সাধারণ কর্মীর পর্যায় থেকে জেলার অন্যতম কৃষক নেতা হয়ে দাঁড়াল। ফলে কৃষক সমিতির আন্দোলন ও সংগঠনের কাজের জন্য তাকে বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে বেড়াতে হত। যখন নিজের গ্রামে ফিরে আসত, তখন দেখা হত জয়মণির সঙ্গে। বাইরে থেকে মনে হত, স্পষ্টরাম নিজেও মনে করত, সমিতির কাজে ছুটোছুটি করবার ফলে জয়মণির কাছ থেকে সে যেন একটু একটু করে দূরে সরে যাচ্ছে। কিন্তু আসলে ব্যাপার ছিল উল্টো। সমিতির কাজের মধ্য দিয়ে তাদের স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের সম্বন্ধটা ঘনিষ্ঠতর হওয়ার পথে এগিয়ে চলছিল। কিন্তু স্পষ্টরামের সে সম্পর্কে কোন ধারণা ছিল না।

একদিন জয়মণি চমকে দিল তাকে। বলল, দেখ, একটা কথা অনেক দিন ধরে বলি বলি করেও বলা হয় নি।

কি কথা? স্পষ্টরাম প্রশ্ন করল।

আমি তোমার মতই কৃষক সমিতির কাজ করতে চাই।

কথা শুনে অবাক হয়ে গেল স্পষ্টরাম। বিস্মিত দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে চেয়ে বলল, তুমি মেয়েমানুষ, সমিতির কাজ তুমি কেমন করে করবে?

কেন, মেয়েমানুষ কি মানুষ নয়? সমিতির কাজ সকলের কাজ। আমরা কি সকলের বাইরে? যে কাজ তোমরা করতে পার, আমরা কেন করতে পারব না?

স্পষ্টরাম এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারল না। কিন্তু কথাটাকে মেনেও নিতে পারল না। মেয়েমানুষও মানুষ একথা ঠিক। কিন্তু তাই বলে পুরুষ আর মেয়ে তো আর এক ধাতু দিয়ে তৈরী নয়। তবু স্ত্রীর মুখের উপর এই কথাটা বলতে তার মুখে বেধে গেল।

জয়মণি বলল, এত ভাবছ কি? তোমাকে বলার আগেই আমি কাজ শুরু করে দিয়েছি। আমাদের এখানকার মেয়েদের মধ্যে অনেকেই এগিয়ে আসতে চাইছে। তারাও কাজ করতে চাইছে। তারা বলছে, আমরাও সমিতির টিকেট কিনে মেম্বার হব।

স্পষ্টরাম স্ত্রীর এই কথার উপর ভালমন্দ কোন কিছু না বলে উপরের নেতাদের কাছে জানাল। উপর থেকে খবর এল, বেশ তো, মেয়েরা কাজ করতে চাইছে এ তো সুখের কথা। ইতিমধ্যে শোনা গেল অন্যান্য অঞ্চলেও মেয়েরা সমিতির কাজ করবার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠেছে।

জয়মণি বর্মণী মহাখুশী হয়ে কোমরে আঁচল বেঁধে কাজে নেমে

গেল। দিনাজপুরের কৃষক আন্দোলন এবার এক নতুন রূপ ধারণ করল। পুরুষ আর মেয়েরা হাতে হাত মিলিয়ে কাজে নামল। অনেক জায়গায় পুরুষদের চেয়ে মেয়েদের উৎসাহ বেশী দেখা গিয়েছে।

জয়মণি বর্মণী দিনাজপুরের মেয়ে কৃষক কর্মীদের মধ্যে সেরা, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। কিন্তু একা নয়, সমস্ত অঞ্চল থেকেই দলে দলে মেয়ে কর্মী বেরিয়ে আসছিল। এদের মধ্যে ঘিয়া বর্মণী, মাতী বর্মণী, বৃন্দাবনী বর্মণী, জয়া বর্মণী এবং আরও অনেকের নাম করা যেতে পারে। কৃষক সমিতির কার্যকলাপ হু হু করে বেড়ে চলছিল। এতদিন স্পষ্টরাম একাই বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়াত, জয়মণিকে ঘর সংসার সামলাতে হত; তার উপর ক্ষেতের কাজকর্মও করতে হত তাকে। কিন্তু এখন ক্ষেতের দিকে নজর দেবে কে? এদিকে ওরা এখন কাজের চাপে এক মুহূর্তের বিশ্রাম পায় না। কখন চাষবাসের দিকে মন দেবে।

ওরা দুজনে মিলে পরামর্শ করে কৃষক সমিতির কাছে প্রস্তাব দিল যে তারা তাদের যথাসর্বস্ব এই চার বিঘা জমি বিক্রি করে সেই টাকা সমিতির তহবিলে দান করে দেবে। তারপর তারা নিশ্চিন্ত মনে সমিতির কাজ করে চলবে। সমিতি প্রথমে নানারকম যুক্তি দেখিয়ে তাদের নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করল। শেষ পর্যন্ত তাদের পীড়াপীড়ির ফলে সমিতি সে জমি বিক্রির টাকা নিয়ে নিতে রাজী হল। আরও স্থির হল যে, সমিতিই এখন তাদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নেবে।

তেভাগার আন্দোলন শুরু হয়ে গেল। এই আন্দোলনকে চালিয়ে নিয়ে যাবার জন্য গুরুত্বপূর্ণ নেতা ও কর্মীদের গা ঢাকা দিয়ে চলতে হচ্ছিল। স্পষ্টরাম ও জয়মণি তখন পলাতক অবস্থায় কাজ

করে চলেছে। তাদের দুজনকেই আন্দোলন পরিচালনা করবার জন্য রাণী শংকাইল থানায় পাঠানো হয়েছিল।

দিনাজপুর জেলার তেভাগা আন্দোলনে মেয়েদের একটি বিশেষ ভূমিকা ছিল। চাষীরা যখন দল বেধে ধান কাটত, তখন মেয়েরা দা, কুড়াল, ঝাঁটা ইত্যাদি নিয়ে ক্ষেতের চারিদিকে দাঁড়িয়ে পাহারা দিত। এই মেয়েদের আক্রমণে পুলিশকে অনেক বারই চম্পট দিতে হয়েছে।

স্পষ্টরাম সিং ১৯৫৩ সালে গ্রেফতার হয়। বিচারে তার আড়াই বছরের সাজা হয়। গ্রেফতার হওয়ার পর পুলিশের হাতে মারপিটের ফলে তার শরীর স্থায়ীভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে। সে ১৯৫৫ সালে জেল হতে মুক্তি পায়। বাইরে আসার পর ১৯৫৬ সালে সে টি বি রোগে মারা যায়।

শহীদ কম্পরাম সিং

□ □ □ □ □

দিনাজপুর জেলার লাহিড়ীহাটে মে দিবসের উৎসব। স্বাধীনতা লাভের বছর খানেক আগেকার কথা। দিনাজপুর শহর থেকে লাহিড়ীহাটে যেতে হলে ঠাকুরগাঁ হয়ে যেতে হয়। ঠাকুরগাঁর পরের স্টেশন আখানগর। আখানগর থেকে লাহিড়ীহাট পর্যন্ত বরাবর একটা কাঁচা রাস্তা চলে গিয়েছে। মাইল সাতেকের পথ। লাহিড়ীহাট নামকরা হাট। বহু দূর দূর থেকে লোকেরা সেখানে হাট করতে আসে।

মে দিবসের সভা। বিরাট সভা। কৃষক সমিতির ডাকে চারিদিককার গ্রামগুলি ভেঙে লোক এসেছে। এখনও আসছে। হাজার কুড়ি লোক সভায় জমায়েত হয়েছে। দিনাজপুরের বিশিষ্ট কৃষক নেতাদের মধ্যে প্রায় সবাই এসেছেন।

লাহিড়ীহাট উৎসব সজ্জায় সেজেছে। সভার সামনে বিরাট এক লাল নিশান সগর্বে পত্ পত্ করে উড়ছে। গেট সাজানো হয়েছে লাল ফেস্টুন দিয়ে। এদিকে, ওদিকে, চারদিকেই লাল নিশানের ছড়াছড়ি। যেদিকেই তাকাও, লালে লাল। মে দিবস

সারা পৃথিবীর মেহনতী মানুষের আনন্দ উৎসবের দিন। এই দিনেই সংগ্রামী শ্রমিকদের বুকের রক্তে রঞ্জিত লাল নিশানের জন্ম হয়েছিল। সেদিন থেকে এই লাল নিশান সারা বিশ্বের মজুর, কৃষক ও সমস্ত মেহনতী মানুষকে সংগ্রামের পথ নির্দেশ করে চলেছে।

কিন্তু এই আনন্দ উৎসবের মাঝখানেও একটা দুঃখের কালোছায়া ছড়িয়ে পড়েছে। একজনের অনুপস্থিতি সবাইকে ব্যথিত করে তুলেছে। এখানে ওখানে বলাবলি চলছে—এমন উৎসবের দিন, এত লোক জড় হয়েছি আমরা, কিন্তু কম্পদা আজ সভায় থাকতে পারল না! এত লোকের মাঝখানেও কেমন যেন খালি খালি লাগছে।

সকল সময় সব কাজে যিনি পুরোভাগে থাকেন, কাজে-কর্মে যার উৎসাহ আর সকলের উৎসাহকে ছাপিয়ে ওঠে, সেই কম্পদা বা কম্পরাম সিং আজ সভায় উপস্থিত থাকতে পারেননি। তার অভাবটা সবার মনেই বাজছে। কম্পদার একটি মাত্র ছেলে। অনেক দিন থেকেই সে রোগে ভুগছিল। সেই ছেলে গত রাত্রিতে মারা গিয়েছে। এ অবস্থায় কম্পদা কি করেই বা আসবেন! তিনি ছেলের শবদেহ দাহন করবার জন্য অন্যান্য শ্মশানবন্ধুদের সঙ্গে শ্মশানে গেছেন।

সভার উদ্যোক্তারা সভার কাজ শুরু করবার জন্য উদ্যোগ আয়োজন করছেন। একজন নওজওয়ান সভার আরম্ভ ঘোষণা করবার জন্য স্লোগান দিতে শুরু করলেন। সঙ্গে সঙ্গে হাজার হাজার মিলিত কণ্ঠের আওয়াজ উঠল। সেই মিলিত আওয়াজে সারা আকাশটা থেকে থেকে কেঁপে উঠতে লাগল।

স্লোগান থামতেই সভার লোকেরা সচকিত হয়ে শুনল,

দূর থেকে অনুরূপ আওয়াজ ভেসে আসছে। এ কি প্রতিধ্বনি? না, প্রতিধ্বনি নয়, লক্ষ্য করে বোঝা গেল, কারা যেন স্লোগান দিতে দিতে সভাস্থলের দিকে এগিয়ে আসছে। সম্ভবত কোন গ্রাম থেকে একদল কৃষক সভায় যোগ দেওয়ার জন্য আসছে। ঠিক তাই। একটু বাদেই দেখা গেল, একটা মিছিল একটা ঝোপের আড়াল কাটিয়ে হঠাৎ সামনে চলে এল। কারা এরা? সবাই উৎসুক হয়ে লক্ষ্য করতে লাগল।

মিছিলটা কাছাকাছি এসে পড়তেই চমকে উঠল সবাই। মিছিলের সামনে সবার আগে এ কে? কম্পদা না? হ্যাঁ, কম্পদাই তো। তাঁর পাশে একটি সাদা থান পরা বিধবা মেয়ে। কম্পদা তাঁর হাত ধরে এগিয়ে আসছেন, আর তাঁর সুপরিচিত জলদগম্ভীর কণ্ঠে স্লোগান দিচ্ছেন, "মে দিবস জয়যুক্ত হোক", "দুনিয়ার মজুর চাষী এক হও।" মিছিলের লোকেরা গলায় গলা মিলিয়ে তাঁর আওয়াজে সাড়া দিয়ে চলেছে।

সেই মিছিল যখন সভার সামনে এসে দাঁড়াল তখন সবাই দেখল কম্পদার কোমরে গামছা বাঁধা, তাঁর মাথার রুক্ষ চুলগুলো উড়ছে। পিছনে আরও কয়েকজন শ্মশানবন্ধু, তাঁদেরও ঐ একই মূর্তি। চেহারা দেখে বোঝা যায় যে, তাঁরা দাহকর্ম শেষ করেই শ্মশান থেকে সোজা সভার জায়গায় চলে এসেছেন। তাঁদের পিছনে শ'খানেক লোক।

থান পরা বিধবা মেয়েটির এক হাত কম্পদার হাতে আর এক হাত দিয়ে সে নিজের মুখ চেপে ধরে ফুলে ফুলে কাঁদছে। সে কি কান্না! কিন্তু কম্পরাম সিং-এর চোখে এক বিন্দু অশ্রু নেই। তিনি সামরিক কায়দায় লাল ঝাণ্ডাকে সেলাম জানিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়ালেন আর সেই অশ্রুমতী মেয়েটিকে পরম স্নেহে নিবিড়ভাবে

কাছে নিলেন। এমন একটা দৃশ্য দেখবার জন্য কেউ প্রস্তুত ছিল না। হাজার হাজার লোক, কারু মুখে কোন কথা নেই, সবাই অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। সঙ্গে সঙ্গেই মঞ্চ থেকে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা নেমে এলেন। তাঁদের মধ্যে একজন দুহাত বাড়িয়ে কম্পদাকে জড়িয়ে ধরলেন। সান্ত্বনার ভঙ্গিতে কি একটা কথা যেন বললেন। কিন্তু কম্পদার মুখে কোন ভাববিকার লক্ষ্য করা গেল না। তেমনি অবিচল, স্থির। কোন কথা না বলে বিধবা পুত্রবধূর হাত ধরে তিনি মঞ্চের উপর গিয়ে উঠলেন।

সভাপতির অনুমতি নিয়ে কম্পদা কিছু বলবার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। কুড়ি হাজার লোক উৎকর্ণ হয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। কি বলবেন কম্পদা? এইমাত্র একমাত্র ছেলেকে পুড়িয়ে ছাই করে এলেন। আর এখনই উঠে দাঁড়িয়েছেন বক্তৃতা দিতে। এ মানুষ কি পাথর না লোহা দিয়ে তৈরী?

কম্পদা বলে চললেন:

ভাইসব, আজ মে দিবসের সভা। আমার আসতে একটু দেরী হয়ে গেল। কেন দেরী হল আপনারা হয়তো তা জানেন। আমার ছেলে, সে তো শুধু আমার ছেলেই ছিল না, সে ছিল আমার বিপ্লবের সাথী, আমার কমরেড। আমার সেই কমরেড আজ আমার পাশে নেই। তাকে চিতার আগুনে ছাই করে দিয়ে এলাম।

ভাইসব, আপনারা হয়তো ভেবেছিলেন যে, আমি সভায় আসব না। আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে অনেকে বাধাও দিয়েছিলেন। কিন্তু আজ মে দিবসের সভা। এই পবিত্র দিনে এখানে আমার হাজার হাজার ভাইরা মিলিত হয়েছেন। এমন দিনে আমি কি তাদের মধ্যে না এসে থাকতে পারি! ভাইসব, সারা দেশ জুড়ে

লক্ষ লক্ষ কৃষক সন্তান আজ তিল তিল করে মৃত্যুমুখে এগিয়ে চলেছে, বেঁচে থেকেও তারা দিবারাত্রি মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করে চলেছে। তাদের বাঁচাবার জন্য আমাদের এই সংগ্রাম। তাদের কথা মনে করলে আমাদের এই ব্যক্তিগত দুঃখ তুচ্ছ হয়ে যায়। আপনাদের সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে আমি আমার পুত্রশোক ঝেড়ে ফেলে দিয়েছি।

সদ্য স্বামীহারা মেয়েটি কম্পদার পায়ের কাছে উপুড় হয়ে পড়েছিল। কম্পদা তাকে তুলে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বললেন, কাঁদিস না বেটী, কাঁদিস না। এই যে তোর সামনে হাজার হাজার কৃষক ভাইদের দেখছিস, এরা তোরই ভাই, তোরই আপন জন। এদের সবার সুখ দুঃখের সঙ্গে তোর নিজের সুখ দুঃখ মিশিয়ে নে। এদের সঙ্গে এক হয়ে সমিতির কাজে আপনাকে ঢেলে দে। এই পথেই শান্তি পাবি, আনন্দ পাবি।

এই বলে পুত্রবধূকে পাশে নিয়ে বসে পড়লেন কম্পদা। বিহ্বল জনতা কয়েক মুহূর্তের জন্য ভাষা হারিয়ে স্তব্ধ হয়ে রইল। তারপর গগনভেদী ধ্বনি উঠল, "কম্পরাম সিং জিন্দাবাদ"। ধ্বনির পর ধ্বনি উঠতে লাগল, ওরা কিছুতেই থামতে চায় না।

মে দিবস এদেশে প্রতি বছরই নিয়মিতভাবে উদ্‌যাপিত হয়ে আসছে। কিন্তু লাহিড়ীহাটের সেদিনকার সেই মে দিবসের অনুষ্ঠান এক নতুন রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করল। এ ছবি তুলে ধরার মত। এই ছবি দেখে আমাদের দেশের চাষী, মজুর আর মেহনতী মানুষেরা প্রেরণা পাবে, উৎসাহ পাবে, সাহস পাবে। কিন্তু যার বলিষ্ঠ তুলির আঁচড়ে এই ছবিটি সার্থকভাবে ফুটে উঠবে, কোথায় সেই শিল্পী?

দিনাজপুর জেলার বালিয়াডাঙ্গা থানার অন্তর্গত উত্তর পারিয়া গ্রামের মাটি উর্বরা। এখানে বহু আত্মত্যাগী ও নির্ভীক কর্মীর সৃষ্টি হয়েছে। কম্পরাম সিং এই গ্রামে জন্মলাভ করেছিলেন। তাঁরা তিন ভাই—কম্পরাম সিং, সন্তরাম সিং আর সেবকদাস সিং। মধ্যবিত্ত কৃষক ঘরের সন্তান, সুখে দুঃখে জীবন কাটছিল। অবস্থার তুলনায় সমাজে তাঁর মর্যাদা ছিল অনেক বেশী। নির্ভীক চরিত্র আর নিঃস্বার্থ সমাজ সেবার জন্য তিনি চিরদিনই সকলের শ্রদ্ধা পেয়ে আসছিলেন।

সমাজের সর্বসাধারণের কল্যাণ কামনা জীবনের শেষ পর্যায়ে তাঁকে এক নতুন পথে টেনে নিয়ে এল। আমাদের দেশে যে বয়সে লোকে আপনাকে সংসার থেকে গুটিয়ে নিয়ে এসে পরলোকের ভাবনায় ডুবে যায়, সেই সময় পঞ্চাশোর্ধে এসে তিনি নবজন্ম লাভ করলেন। কৃষক আন্দোলনের ঢেউ তখন সারা বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়েছে। সেই ঢেউ দিনাজপুর জেলার চির-নিপীড়িত কৃষক সমাজকে আন্দোলিত ও প্রাণচঞ্চল করে তুলল। বার্ধক্যের দুয়ারে দাঁড়িয়েও কম্পরাম সিং কৃষক সমিতির আহ্বানে সাড়া দিতে দেরী করেন নি।

কৃষক সমিতির নির্দেশে হাটে হাটে তোলাবটি বা তোলাগণ্ডি আন্দোলন শুরু হয়ে গেল। প্রবল প্রতাপশালী জমিদারেরা দীর্ঘদিন ধরে হাটে হাটে তোলা আদায় নিয়ে অকথ্য জুলুম চালিয়ে আসছিল। জমিদারের দুর্দান্ত কর্মচারীরা ক্রেতা ও বিক্রেতা দু'পক্ষের কাছ থেকেই ভারী হাতে তোলা আদায় করত। নিতান্ত গরীব-গরবা মানুষ, যারা দু-চার পয়সার কাজ কারবার করতে যেত তারাও তাদের হাত থেকে রেহাই পেত না।

এই অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে আপত্তি করতে বা প্রতিবাদ

জানাতে গেলে মারপিট খেয়ে কাঁদতে কাঁদতে ঘরে ফিরতে হত। কৃষকদের এমন মনোবল বা ঐক্যবদ্ধ শক্তি ছিল না যে তাদের বিরুদ্ধে সাহস করে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে। তারা ভাগ্যের দোহাই দিয়ে সব কিছুই মুখ বুজে সহ্য করে যেত। দীর্ঘ দিন ধরে শুধু দিনাজপুর নয়, সারা বাংলা দেশ জুড়ে এই ধারাই চলে আসছিল। কিন্তু যুগের ধর্মে হাওয়া বদলে গেল। দিনাজপুরের কৃষকেরা জমিদারের এই বল্গাহীন জুলুমের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ঘোষণা করল।

ব্যাপার দেখে সারা দেশের লোকের বিস্ময়ের সীমা রইল না। দিনাজপুরের মাটিতে এমন সমস্ত ঘটনা ঘটতে পারে, এ যে স্বপ্নেরও অগোচর। দেখা গেল, গ্রামে গ্রামে কৃষক সমিতির লাঠি-ধারী ভলান্টিয়াররা কুচকাওয়াজ করছে। হাটের দিনে তারা সুশৃঙ্খলভাবে মার্চ করে হাটে হাটে যায়, সারা হাট টহল দিয়ে বেড়ায়, মাঝে মাঝে সুবিধামত জায়গায় দাঁড়িয়ে এই জুলুমের বিরুদ্ধে প্রচার বক্তৃতা করে আর কিছু সময় বাদে বাদেই আওয়াজ তোলে—"তোলা আদায় বন্ধ কর", "কৃষক সমিতি জিন্দাবাদ"। তাদের মিলিত আওয়াজে সারা হাটটা গম গম করতে থাকে। হাটুরে লোকেরা হাতের কাজ বন্ধ রেখে মুগ্ধ হয়ে তাদের বক্তৃতা শোনে। ওদের সাহস দেখে তারা অবাক হয়ে যায়।

লাহিড়ীহাট থেকে পাঁচ মাইল দূরে কম্পরাম সিং-এর গ্রাম উত্তর পারিয়া। কম্পরাম সিং লাহিড়ীহাটের তোলাবটি আন্দোলন পরিচালনা করেন। আন্দোলন দিন দিন প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে উঠতে লাগল। জমিদার পক্ষও চুপ করে বসে ছিল না। তারা প্রথম থেকেই থানার লোকদের সঙ্গে ঘোঁট পাকিয়ে চলছিল। এই সব নিয়ে উপরওয়ালা অফিসারদের সঙ্গেও তাদের দহরম মহরম

চলছিল। উপরওয়ালা প্রভুরা ভয় পেয়ে গিয়েছিল। যে চাষীরা সাত চড়েও রা' করত না, নিঃশব্দে পড়ে পড়ে মার খেত, তাদের মধ্যে এত সাহস কেমন করে এল? এ তো ভাল কথা নয়। এর ভবিষ্যৎ ভেবে ওরা দস্তুরমত চিন্তিত হয়ে উঠল। আর এদের প্রশ্রয় দেওয়া চলে না। একটা কিছু করতেই হবে।

অবশেষে ওদের যা করবার তাই ওরা করল। ওরা কম্পরাম সিংকে গ্রেফতার করে জেলখানায় নিয়ে পুরল। ওরা আশা করছিল এর পরে চাষীরা ভয় পেয়ে আন্দোলন থামিয়ে দেবে। কিন্তু ওদের মনস্কামনা পূর্ণ হল না। ফল হ'ল উল্টো। তাদের প্রিয় নেতাকে তাদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে যাবার ফলে ক্ষেপে আগুন হয়ে উঠল চাষীরা। আন্দোলন ভাঙ্গা দূরে থাক, আরও শক্তিশালী হয়ে উঠতে লাগল। শেষ পর্যন্ত জমিদার পক্ষ আর সরকার পক্ষের সমস্ত কৌশল ও ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্নভিন্ন করে চাষীরাই জয়লাভ করল। লাহিড়ীহাট ভেঙ্গে গেল। কৃষক সমিতির উদ্যোগে নতুন হাট গড়ে উঠল। দিনাজপুর আর রংপুর জেলায় এই ভাবে কতকগুলি নতুন হাট গড়ে উঠছিল। তাদের মধ্যে কয়েকটির নাম দেওয়া হয়েছে 'সমিতির হাট'। আজও তারা সেই নামেই পরিচিত।

তিন মাস হাজত খাটবার পর কম্পরাম সিং মুক্ত হয়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন। তাঁর নাম তখন সারা জেলায় ছড়িয়ে পড়েছে। এখন থেকে তাঁর কাজ শুধু তাঁর নিজের এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে রইল না, জেলার নানা জায়গা থেকে তাঁর ডাক আসতে লাগল। বিশ্রামের সময় নেই। নিজের ঘরসংসারের কথা আর ভবিষ্যতের চিন্তা পড়ে রইল পিছনে। তিনি সারাক্ষণের কর্মী হয়ে আপনাকে কাজের মধ্যে ঢেলে দিলেন।

তোলাবটি আন্দোলন থেমে যাবার পর কৃষক আন্দোলনের দ্বিতীয় তরঙ্গ জেগে উঠল। সারা উত্তরবঙ্গ অঞ্চলে বর্গা চাষীদের তেভাগা আন্দোলনের প্লাবন বয়ে গেল। এই আন্দোলন সবচেয়ে প্রবল রূপ ধারণ করেছিল এই দিনাজপুর জেলায়। এখানকার মত এত বড় বড় জোতদার আর কোথাও নেই। এমন নিঃস্ব ভূমিহীন চাষীও আর কোথায় দেখা যায় না। সেই জন্যই এখানকার আধিয়ার চাষীরা তাদের জীবনের মায়া ছেড়ে মরিয়া হয়ে লড়তে নেমেছিল।

কম্পরাম সিং তাঁর জ্ঞাতিভাই ঠুমনিয়ার ডোমারাম সিং ও রামপুর মোলানীর অভরণ সিং পলাতক অবস্থায় বলিয়াডিঙ্গা, অটোয়ারী ও রাণীশংকাইল এই তিনটি থানায় তেভাগা আন্দোলনের নেতৃত্ব করেন। তাঁদের সকলের মাথার উপর হুলিয়া ঝুলছিল। কম্পরাম সিং দুই বৎসর পর্যন্ত পলাতক জীবন যাপন করেন। দুই বৎসর বাদে এই হুলিয়া প্রত্যাহার করে নেবার পর তিনি দেশবাসীর সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করেন।

স্বাধীনতা লাভের পর মুসলিম লীগের নেতারা গদী দখল করে দোর্দণ্ড প্রতাপে দেশ শাসন করতে শুরু করল। এই সময় ট্রেড ইউনিয়ন, কৃষক সমিতি প্রভৃতি শ্রেণী সংগঠনগুলিকে চূর্ণ করে দেবার জন্য সরকারের তরফ থেকে সুপরিকল্পিতভাবে আক্রমণের পর আক্রমণ চালানো হতে থাকে। শত শত কর্মীকে বিনা বিচারে আটক করা হয়। এই সময় ১৯৪৯ সালে কম্পরাম সিংকে গ্রেফতার করে রাজবন্দী হিসাবে রাজশাহী সেন্ট্রাল জেলে পাঠান হয়। জন্মভূমির বুক থেকে এই তাঁর শেষ বিদায়। দিনাজপুরের চাষীরা কি একবারও ভাবতে পেরেছিল যে তাদের প্রিয় নেতা কম্পদাকে আর কোনদিন তারা দেখতে পাবে না।

রাজশাহী সেন্ট্রাল জেলের খাপরা ওয়ার্ড সাতজন শহিদের স্মৃতি বহন করছে। কম্পরাম সিং সেই সাতজনের একজন। এই সাতজন শহিদের নাম কম্পরাম সিং, দেলওয়ার, বিজয় সেন, আনোয়ার, সুধীন ধর, সুখেন্দ্র ভট্টাচার্য ও হানিফ।

১৯৫০ সালের ২৩ এপ্রিল। এই দিনটি বিশেষভাবে স্মরণীয়। এই দিনেই রাজশাহী সেন্ট্রাল জেলের খাপরা ওয়ার্ডে রাজবন্দীদের উপর গুলি চালানো হয়। গুলিবর্ষণের ফলে সাতজন রাজবন্দী নিহত এবং অন্যান্য রাজবন্দীদের মধ্যে অনেকেই গুরুতর ভাবে আহত হন। তাঁদের মধ্যে একজনের একটা পা কেটে বাদ দিতে হয়েছে। তাঁর নাম নুরুন্নবী চৌধুরী।

তখন মুসলিম লীগের আমল। বাইরে দমননীতির রুদ্র তাণ্ডব চলছিল। জেলের ভিতরেও রাজবন্দীদের উপরে চলছিল অমানুষিক দুর্ব্যবহার আর লাঞ্ছনা। বৃটিশ আমল থেকে রাজবন্দী হিসাবে তাঁরা যে সব সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার ভোগ করে আসছিলেন, মুসলিম লীগ সরকার কলমের এক খোঁচায় তার সব কিছুই কেড়ে নিলেন। কিন্তু রাজবন্দীরা দিনের পর দিন মাসের পর মাস সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন তাঁদের এই অধিকারগুলোকে ফিরে পাবার জন্য। এই ব্যাপারে ঢাকা জেল ও আরও কয়েকটি জেলে দীর্ঘ দিন ধরে অনশন ধর্মঘট চালানো হয়। এই অনশন ধর্মঘটের ফলে ঢাকা জেলে কুষ্টিয়ার শিবেন রায় আত্মাহুতি দিয়ে শহিদ হয়েছেন। রাজশাহী সেন্ট্রাল জেলের গুলি চালনার ঘটনা সেই সংগ্রামেরই একটি রক্তাক্ত অধ্যায়।

সরকার ও জেল কর্তৃপক্ষের অপমানজনক ব্যবহারের ফলে জেল কর্তৃপক্ষ ও রাজবন্দীদের পরস্পরের সম্পর্কটা ক্রমেই তিক্ত থেকে তিক্ততর হয়ে উঠছিল। ফলে, বাদ-বিসংবাদ, ঝগড়াঝাটি নিত্য-

নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। জেলখানার পিঞ্জরের মধ্যে আবদ্ধ রাজবন্দীদের উপর এই নির্বিচার ও নির্মম গুলিবর্ষণ তারই চূড়ান্ত পরিণতি।

শোনা যায় রাজধানী ঢাকা থেকে গুলি চালনার জন্য নির্দেশ গিয়েছিল। রাজবন্দীদের প্রতিরোধ সংগ্রামকে চূর্ণ করে দেবার জন্য ওরা এই নৃশংস জল্লাদের ভূমিকায় নেমেছিল।

২৩শে এপ্রিল তারিখে সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট বিল সাহেব তাঁর দলবল সহ রাজবন্দীদের সঙ্গে আলাপ করবার জন্য ওয়ার্ডে এলেন। সচরাচর এমন সময় তিনি আসতেন না। সেদিন যে পৈশাচিক পরিকল্পনা নিয়ে তিনি এসেছিলেন, সে কথা কল্পনা করাও সম্ভব ছিল না।

বিল সাহেব রাজবন্দীদের প্রতিনিধির সঙ্গে আলাপ করছিলেন। আলোচনা চলতে চলতে কথা কাটাকাটির মধ্য দিয়ে দুপক্ষই উত্তেজনার চরম সীমায় গিয়ে পৌঁছল। সেই সময় বিল সাহেব আচমকা ঘরের বাইরে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দেবার জন্য হুকুম দিলেন। সমস্ত কিছুই পূর্ব পরিকল্পিত, আগে থেকেই সব কিছু ঠিক করা ছিল, আলাপ-আলোচনা একটা ভাঁওতা মাত্র।

দরজাটা বন্ধ করেই বন্দুকধারী সিপাইরা এপাশ থেকে ওপাশ থেকে জানলার শিকের মধ্য দিয়ে গুলি চালাতে শুরু করল। আত্মরক্ষার কোন উপায় ছিল না। গুলিতে গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে পড়ে গেল সবাই। ঘরের মেঝে রক্তে ভেসে গেল। কিন্তু এতেও তুষ্ট হল না ওরা। প্রথম পর্ব শেষ করে এবার একদল লাঠিধারী সিপাই দরজা খুলে ঢুকে পড়ল ভিতরে। তারপর মনের আক্রোশ মিটাবার জন্য যারা বেঁচে ছিল, তাদের বেছে বেছে লাঠিপেটা করতে লাগল। তারপর হত আহতেরা ঐভাবেই ঘণ্টা কয়েক পড়ে রইল।

যুদ্ধের মধ্যেও শত্রুপক্ষের আহত বন্দীদের জন্য প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। এখানে তাও হল না। আহতদের মধ্যে যাদের জ্ঞান ছিল তারা আকণ্ঠ তৃষ্ণায় 'পানি পানি' বলে কাতরে মরছিল। কিন্তু নির্মম ঘাতকের দল তা শুনেও শুনল না। স্বাধীনতা লাভের তিন বৎসর পরে দুর্ভাগা দেশের দেশপ্রেমিক সন্তানদের এই ভাবেই পুরস্কৃত করা হল।

সেই সাতটি মৃতদেহ ওরা কোথায় লুকিয়ে ফেলল, তাদের কি গতি করল, কেউ তা জানেনা। তাঁদের জন্য কোন স্মৃতি সৌধও ওঠেনি। শুধু খাপড়া ওয়ার্ড সেই বেদনাবহ স্মৃতির গুরুভার বুকে নিয়ে নির্বাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। বীর শহিদদের রক্তস্নাত খাপরা ওয়ার্ডের পুণ্যভূমি একদিন কি দেশবাসীর তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হবে না?

এই ভাবেই জেলের মধ্যে প্রাণ দিলেন আমাদের কম্পদা— দিনাজপুরের কৃষক সংগ্রামের বীর সেনানী কম্পরাম সিং। তখন তাঁর বয়স তেষট্টি। দিনাজপুরের চাষীরা, যাঁরা তাঁকে দেখেছে বা তাঁর কথা শুনেছে, তারা তাঁর কথা স্মরণ করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে। দিনাজপুর তথা উত্তরবঙ্গের কৃষক কর্মীরা এই মহান দেশপ্রেমিকের জীবনকথা শুনে প্রেরণা পায়, উৎসাহ পায়, চলার পথের সন্ধান পায়। তাদের মধ্যে বেঁচে আছেন আমাদের কম্পদা—দিনাজপুরের কৃষক সংগ্রামের বীর সেনানী কম্পরাম সিং।

জাল মোহাম্মদ

□ □ □ □

জাল মোহাম্মদ আর খোকা বাইশ দুই বন্ধু ঢেমঢেমি কালীর মেলায় গরু কিনতে গিয়েছিল। ঢেমঢেমি কালীর মেলা দিনাজপুরের নামকরা মেলা। এই মেলায় বিস্তর গরু আর মহিষ বিক্রি হয়। দিনাজপুর জেলার শেষ সীমা। কিছু দূরেই ভুল্লি নদী। নদীর এপারে দিনাজপুর, ওপারে জলপাইগুড়ি। আজ ভুল্লি বর্ডার প্রহরীর মত এই দুইটি জেলাকে বিচ্ছিন্ন করে সতর্কভাবে পাহারা দিয়ে চলেছে। কিন্তু যখনকার কথা বলছি, তখন দেশ বিভাগ হয় নি, ভুল্লি এই দুই জেলাকে স্নেহালিঙ্গনে বেঁধে রাখত। সে ছিল এই দুই জেলার মিলনসূত্র।

গ্রামাঞ্চলের সব মেলাই কৃষকের মেলা। তবে ঢেমঢেমি কালীর মেলা গরু আর মহিষের বড় বাজার বলে নানা অঞ্চল থেকে কৃষকেরা দলে দলে এই মেলায় আসত, দু'চার দিন থেকে কেনাবেচা করত, ফুর্তি আমোদ করত, তারপর মালপত্র নিয়ে কেউ হাঁটা পথে, কেউ বা গরুর গাড়ীতে যার যার ঘরে ফিরত। জায়গাটা বীরগঞ্জ থানার অধীনে। জাল মোহাম্মদের বাড়ী কাহারোল

থানায় তারগাঁও গ্রামে। সেখান থেকে মাইল তিনেক দূরে তারাপুর গ্রামে খোকা বাইশের বাড়ী। ১৩৷১৪ মাইল পথ ভেঙ্গে দুই বন্ধু এই মেলায় এসেছিল। এইবারই প্রথম নয়, প্রায় প্রতি বছরই আসত। কাজ থাকলেও আসত, না থাকলেও আসত।

এবার ওরা মেলায় এসে যা দেখল, এমন দৃশ্য আর কোনদিন দেখেনি, এমন কথা কানেও শোনেনি কোনদিন। এই মেলায় গরু বা মহিষ বিক্রি করতে হলে গরু প্রতি পাঁচসিকা আর মহিষ-প্রতি দেড় টাকা লেখাই বা তোলা দিতে হয়। আগে লেখাইয়ের হার এর চেয়ে কম ছিল। কয়েক বছর হয় বাড়িয়ে পাঁচসিকা আর দেড় টাকা করা হয়েছে। এই নিয়ে লোকের মধ্যে খুবই অসন্তোষ। তোলা আদায়কারীরা আদায় করতে এলে বিক্রেতারা একটু কমসম করে নেবার জন্য অনুনয় বিনয় করত, সময় সময় কথা কাটাকাটিও হয়েছে, কিন্তু ওই পর্যন্তই। এর চেয়ে উঁচু সুরে প্রতিবাদ করবার মত বুকের পাটা ছিল না তাদের। কিন্তু এবার কি যেন হয়েছে। হাওয়া উলটে গেছে। জমিদারের লোকেরা তোলা আদায় করতে এলে বিক্রেতারা ওদের মুখের উপর সাফ জবাব দিয়ে দেয়, আমরা অভাবের জ্বালায় মরতে বসেছি, এখন আমরা এক পয়সাও লেখাই দিতে পারব না। কি আশ্চর্য, একটু ভয় নেই প্রাণে! এত সাহস ওরা কোত্থেকে পায়? দুই বন্ধু অবাক হয়ে পরস্পর বলাবলি করে।

এত সাহস ওরা কোত্থেকে পায়?—কিছু বাদেই এই প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেল। চমকে উঠল ওরা। মেলার দক্ষিণ দিকে বহু লোকের মিলিত আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। আওয়াজটা যেন ক্রমেই এগিয়ে আসছে। কি ব্যাপার ঘটছে, দেখবার জন্য ওরা ব্যগ্র হয়ে ছুটে গেল। কিছুটা এগিয়ে যেতেই ওদের চোখে পড়ল, পিঁপড়ের

মত সার বেঁধে একদল লোক আসছে, তাদের প্রত্যেকের হাতে লাঠি। যুদ্ধের সৈন্যরা যেভাবে মার্চ করে আসে, তেমনি সুশৃঙ্খলভাবে এগিয়ে আসছিল ওরা। ওদের বিস্মিত ও মুগ্ধ দৃষ্টির সামনে দিয়ে এই কৃষক বাহিনী মেলার মধ্যে এসে ঢুকল। তারা আওয়াজ তুলছিল, "গরুর লেখাই বন্ধ কর", "কৃষক সমিতি জিন্দাবাদ"। আরও কত কি বলছিল, তার অনেক কথাই বোঝা যাচ্ছিল না।

ওরা লোকের কাছে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানল, এরা কৃষক সমিতির ভলান্টিয়ার, গরু মহিষের লেখাই বন্ধ করার জন্য আন্দোলন করছে। কৃষক সমিতির কাজ তখন সবেমাত্র এখানে ওখানে শুরু হয়েছে। জাল মোহাম্মদ আর খোকা বাইশ এই উপলক্ষে তার নাম প্রথম শুনল। যে লোকটি ভলান্টিয়ারদের লাইনের বাইরে দাঁড়িয়ে চোঙা ফুঁকে আওয়াজ দিচ্ছিল, সেই নাকি এদের নেতা। সে-ই এখানকার কৃষক সমিতি সৃষ্টি করে তুলেছে। নাম তার মাধব দত্ত। বাড়ী বোদা অঞ্চলে। বোদা তখন দিনাজপুর জেলার অঙ্গ ছিল। দেশ বিভাগের সময় জলপাইগুড়ির সঙ্গে যুক্ত হয়ে গিয়েছে।

জাল মোহাম্মদের মনে পড়ল, মাধব দত্তের নামটা তার কাছে খুবই পরিচিত। নানা লোকের কাছে তার সম্পর্কে অনেক গল্প শুনেছে। সাংঘাতিক লোক মাধব দত্ত। সে আর তাদের গোপন দলের লোকেরা পিস্তল, বন্দুক আর বোমা নিয়ে ইংরাজদের সঙ্গে লড়াই করত। ক্ষুদিরামের দলের লোক ওরা, ওদের ভয়-ডর বলতে কিছু ছিল না। সাহেবরা এদের ভয়ে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপত। এ সব গল্প শুনতে শুনতে জাল মোহাম্মদ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠত। হ্যাঁ, সারা দেশের মধ্যে মরদ যদি থাকে তো এরাই আছে। সময় সময় তার মনে ইচ্ছা জাগত যে, এই গোপন দলের সঙ্গে যোগ দিয়ে

সাহেবদের বিরুদ্ধে লড়াই করবে। কিন্তু কোথায় গেলে তাদের উদ্দেশ্য পাওয়া যাবে? মাধব দত্ত আর তার সহকর্মীদের মধ্যে অনেকেই জেলে পচে মরছে। আর শোনা যায়, ওদের দলও নাকি ভেঙ্গে গেছে। তার জন্যই তো দেশটা এমন ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছে। কি আফসোসের কথা।

ইতিমধ্যে মাধব দত্ত কবে জেল থেকে বেরিয়ে এসেছে, এ খবরটা জানা ছিল না তার। বাইরে এসে এবার সে এক নতুন পালা শুরু করে দিয়েছে। কিন্তু হায়রে হায়, এই নাকি সেই মাধব দত্ত! জাল মোহাম্মদ যেন সাত আশমানের উপর থেকে মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়ল! এই নিতান্ত সাধারণ গোবেচারা চেহারার লোকটা—কি শক্তি আছে তার, কি করতে পারে সে? মনে মনে মাধব দত্তের কি এক বিরাট মূর্তিই না সে গড়ে তুলেছিল! কিন্তু এখন ওই হাতকাটা ফতুয়া গায়ে চোঙাফোঁকা অতি সাধারণ লোকটা সেই কল্পনায় গড়া বিরাট মূর্তিটাকে ভেঙ্গে চুরমার করে দিল।

কিন্তু সেই অতি সাধারণ লোকটি একটু বাদেই অসাধারণ রূপ নিয়ে দেখা দিল তার সামনে! মাধব দত্ত একটা ফাঁকা জায়গায় দাঁড়িয়ে জমিদারের জুলুম ও শোষণের বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিয়ে চলছিল। জাল মোহাম্মদ কৃষকের সন্তান, কৃষকের সুখ দুঃখের কোন কথাই তার কাছে অজানা নয়। কিন্তু কি আশ্চর্য, কৃষকদের এই সমস্ত দুঃখ লাঞ্ছনা কোনদিন তার মনকে এমন-ভাবে দোলা দেয়নি। সে উৎকর্ণ হয়ে তার কথা শুনতে লাগল। শুধু সে-ই নয়, মেলার ক্রেতা-বিক্রেতাদের মধ্যে অনেকেই কেনা-বেচার কাজ বন্ধ করে তার কথা শুনছে। থানার একজন অফিসার জনকয়েক লালপাগড়ী নিয়ে একপাশে দাঁড়িয়ে তার কথাগুলি

গোগ্রাসে গিলে চলেছে। মাঝে মাঝে নোট বই খুলে কি যেন টুকছে। জমিদার পক্ষের কয়েকজন লোক পুলিশদের পাশে দাঁড়িয়ে মৃদুস্বরে কি বলাবলি করছে।

জমিদার আর পুলিশ এদের কে না ভয় করে। চাষাভুষো মানুষ কোনদিন জমিদারের কর্মচারী বা পুলিশের দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে কথা বলতে পারে না। সমস্ত রকম জুলুম আর অত্যাচার তারা সব সময়ই মুখ বুজে হজম করে। জাল মোহাম্মদ তার জীবনের এতদিনকার অভিজ্ঞতায় এইটাই স্বাভাবিক নিয়ম বলে জেনে এসেছে। এর বিপরীতও যে ঘটতে পারে, এমন কথা ভাবতে পারেনি কখনও। সেও না, তার বন্ধু খোকা বাইশও না। দুজনের জীবনেই এ এক নতুন অভিজ্ঞতা। এই যে তিন চারশো কৃষক সমিতির ভলান্টিয়ার, এরা সবাই গরীব চাষী। কিন্তু ওই জমিদারের সর্দার আর পুলিশের লোকের সামনে কেমন বুক টান করে দাঁড়িয়ে আছে। আর ওদের চালচলন দেখে বোঝা যায়, লাঠিগুলি শুধু ওদের হাতের শোভা নয়, প্রয়োজন হ'লে তারা এর ব্যবহার করতে পিছপা হবে না। কেমন সেই কৃষক সমিতি আর কেমন তাদের নেতা, যার প্রেরণা ও পরিচালনায় এই সাহসী ও মজবুত কৃষক বাহিনী গড়ে উঠেছে। ওরা দুই বন্ধু অবাক হয়ে এই কথাই বলাবলি করেছিল।

ওরা দিন দুয়েকের জন্য এসেছিল। কিন্তু এর শেষ পরিণতি কোথায় দাঁড়ায় দেখবার জন্য আরও কয়েকটা দিন থেকে গেল। ওদের মত বাইরের লোকেরা প্রথমে যা অসম্ভব বলে মনে করেছিল, এখানকার কৃষক সমিতি সেই অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলল। এবারকার মেলায় লেখাই ছাড়াই গরু মহিষ বিক্রি হল। কৃষক সমিতি তার আন্দোলনের প্রথম রাউণ্ডে জয়লাভ করল। যাবার

আগে জাল মোহাম্মদ আর খোকা বাইশ মাধব দত্তের সঙ্গে দেখা করে কৃষক আন্দোলন ও কৃষক সমিতি গঠন সম্পর্কে বিস্তারিত ভাবে আলাপ করে নিজেদের এলাকায় ফিরে গেল।

জাল মোহাম্মদ ফিরে এল তার নিজের গ্রামে। মাত্র ক'দিনের জন্য নিজের এলাকা ছেড়ে বাইরে গিয়েছিল। তারই মধ্যে একেবারে নতুন মানুষ হয়ে ফিরে এল। দেশের লোক তার অদ্ভুত পরিবর্তন দেখে অবাক হয়ে গেল।

মধ্যবিত্ত কৃষক ঘরের ছেলে। স্বচ্ছল সংসার, অভাবের জ্বালা কোনদিনই সহ্য করতে হয়নি। সৌখিন স্বভাবের লোক, ক্ষেতিখোলা দেখাশুনা করবার ভারে অন্যের উপর চাপিয়ে দিয়ে জাল মোহাম্মদ নিজের খেয়ালের স্রোতে ভেসে বেড়াত। সে নিজে ভাল গাইতে পারত, তাছাড়া তারই মত স্বভাবের আর তারই মত উৎসাহী একদল গ্রাম্য গায়ককে নিয়ে সে একটি সখের গানের দল গড়ে তুলেছিল। এই গানের দল নিয়ে সে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াত। এই গানের দলের জন্যই কাহারোল থানা এবং পাশাপাশি আরো দু একটা থানার মধ্যে তার নাম সুপরিচিত হয়ে উঠেছিল।

সংসারের কাজকর্মে তার মন ছিল না। যখন মাথায় যে খেয়াল চাপত, তাই নিয়ে মত্ত হয়ে থাকত সে। ফলে তার কাছ থেকে কেউ কোন দায়িত্বপূর্ণ কাজের প্রত্যাশা করতে না। তার এই হালকা স্বভাবের জন্য লোকে তার নাম দিয়েছিল "জাল-ফাতরা"। সেই জাল-ফাতরা যে একদিন একটা ব্যাপক অঞ্চল জুড়ে কৃষক আন্দোলন পরিচালনা করবে এবং দিনাজপুর জেলার একজন বিশিষ্ট কৃষক নেতা হয়ে দাঁড়াবে, এমন কথা কল্পনা করাও সম্ভব ছিল না।

কিন্তু যা অকল্পনীয়, বাস্তব জগতে এমন সব ঘটনা অনেক সময়ই

ঘটে থাকে। জাল মোহাম্মদ সেই সত্যটাকে আবার নতুন করে প্রমাণ করলো। তারগাঁও-এর গান-পাগলা জাল-ফাতরা আর তারাপুরের খোকা বাইশ এবার নতুন ভূমিকা নিয়ে আসরে নেমেছে। ঢেমঢেমি কালীর মেলায় কৃষক সমিতির আন্দোলন আর তার সাফল্যের সংবাদ তারা ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে লাগল। প্রত্যক্ষদর্শীর অভাব ছিল না। এ অঞ্চল থেকে অনেক লোক মেলায় গিয়েছিল। তারা স্বচক্ষে দেখে এসেছে, এবার মেলায় লেখাই ছাড়াই গরু মহিষ বিক্রি হয়েছে। এমন আশ্চর্য ব্যাপার তারা কেন, তাদের বাপ দাদারাও কোনদিন চোখে দেখেনি। জমিদাররা কি কখনও ইচ্ছা করে তাদের মুখের গ্রাস ছেড়ে দেয়। ইচ্ছা করে নয়, দয়া করে নয়, কৃষক সমিতির ভলান্টিয়ারদের লাঠির ভয়ে ওরা অনুপায় হয়ে কৃষক সমিতির দাবি মেনে নিয়েছে। জোট বাঁধতে পারলে কি না হয়!

এখানে ওখানে এসব কথা নিয়ে বলাবলি, আলাপ আলোচনা আপনা থেকেই উঠেছিল, দু'চারদিন বাদে হয়তো আপনা থেকেই থেমে যেত। কিন্তু জাল মোহাম্মদ থেমে যেতে দিল না, ফুঁ দিয়ে দিয়ে উসকে তুলল আগুনটাকে। যে কথাটা জনকয়েকের মুখে ছিল, তা এবার সারা অঞ্চলের কৃষকদের মুখে মুখে ফিরতে লাগল। কিন্তু শুধু বাত কী বাত নয়, কৃষকরা এবার কাজের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল। কাহারোলের হাট তারগাঁও থেকে মাইল পাঁচেক দূরে। এ অঞ্চলের সবাই এই হাটে যায়। শনিবারের হাট মস্ত বড় হাট। এ হাটে বিক্রির জন্য অনেক গরু-ছাগল ওঠে। আর সব জায়গার মত এখানেও গরু-ছাগলের উপর লেখাই আদায় করা হয়। এ ছাড়া ধান-পাট-তরিতরকারী সব কিছুর উপরেই তোলা আছে। এমন কি যে সব গরীব লোকেরা শাক-সব্জি আর এটা সেটা বিক্রি

করতে আসে, জমিদারের লোকদের হামলা থেকে তারাও রেহাই পায় না। ওদের চক্ষুলজ্জাটুকু পর্যন্ত নেই। এ নিয়ে অসন্তোষ আর অভিযোগ বহুদিন থেকেই জমে ছিল। এবার অনুকূল আবহাওয়া পেয়ে সেই অসন্তোষ ফেটে পড়ল। কৃষকরা বলতে লাগল, আমরাও আর এই হাটের তোলা দিতে পারব না। এসব জুলুম আর চলবে না। ঢেমঢেমি কালীর মেলায় যদি তোলা ছাড়া বেচাকেনা করতে পারে তবে আমরাই বা পারব না কেন ?

জাল মোহাম্মদ উত্তর দিল, ঠিক কথা, আমরাই বা পারব না কেন ? তারাও যা আমরাও তাই, আমরা সবাই একই ধানে-চালে মানুষ। কিন্তু শুধু কথা বললেই তো হয় না। কালীর মেলায় ওদের যা উদ্যোগ-আয়োজন ছিল, আমাদের কি তা আছে ? আমাদের কৃষক সমিতি কোথায় ? ভলান্টিয়ারই বা কোথায় ? আমাদের দাবি তো ওরা শুধু আমাদের মুখের কথায় মেনে নেবে না।

কৃষকরা বলল, হক কথাই বলেছ। মুখের কথায় চিঁড়া ভেজে না। ওরা কি সোজা কথার মানুষ ? আমাদের কৃষক সমিতি নাই, ভলান্টিয়ার নাই সত্যি কথা। কিন্তু তাতে হয়েছে কি ? ওদেরই কি আগে ছিল ? ওরা দরকার বুঝেছে করেছে। তোমার আগে আর কেউ তো আমাদের এসব কথা এমন করে বোঝায়নি। এখন আমরা যখন বুঝতে পারছি, তখন আমরাই আমাদের এক এক ঘর থেকে এক একজন করে ভলান্টিয়ার দেব, আমরাই আমাদের কৃষক সমিতি গড়ে তুলব। এ কাজের জন্য তুমি যা করতে বল, আমরা সবটাতেই রাজী আছি। তুমি ভাবছ কেন ?

কৃষকদের কাছ থেকে এত সহজে সাড়া পাবে জাল মোহাম্মদ এটা আশা করতে পারেনি। সেই দিন থেকেই ভলান্টিয়ারের দলে

নাম লেখবার জন্য তার কাছে লোক আসতে শুরু করল। হাওয়ার কি গুণ! জাল মোহাম্মদ অবাক হয়ে দেখল, যে ছেলেগুলোকে এতদিন সবাই নির্জীব আর সব কর্মের বাইরে বলে মনে করত, তারাও কেমন চাঙ্গা হয়ে উঠেছে, তারাও আসছে ভলান্টিয়ারের দলে নাম লেখাতে।

ঘরে ঘরে এই নিয়ে আলোচনা। পথে বেরোলেই লোকে প্রশ্ন করে, কি জাল ভাই, আমরা কাহারোল হাট দখল করতে যাচ্ছি কবে? আর দেরী কেন?

হবে, হবে,—জাল মোহাম্মদ হাসিমুখে আশ্বাস দেয়।

বুড়োরা পিঠ চাপড়ে দিয়ে উৎসাহ দেয়, ঠিক আছে। আমরা বুড়ো হয়েছি, বেশী কিছু করবার সামর্থ্য নেই, কিন্তু আমরা সব সময় তোমাদের সঙ্গে আছি। আমরা দোয়া করছি, তোমাদের কাজ হাসিল করে তোমরা ফিরে আসবে।

এই সব কথা যেন মন্ত্রের মত কাজ করে। তার উপরে এতগুলো মানুষের বিশ্বাস আর নির্ভরতা তাকে দিন দিনই দৃঢ় আর মজবুত করে তুলতে থাকে। জাল মোহাম্মদ এই ক'টি দিনের মধ্যেই তার পুরনো জগত ছেড়ে এক নতুন জগতে এসে পা ফেলেছে। গান-পাগলা জাল-ফাতরা নতুন মানুষ হয়ে উঠেছে। এ এক বিচিত্র অনুভূতি। মানুষের জীবনে যখন এই ভাবে নবজন্মের প্রক্রিয়া কাজ করে চলতে থাকে, তখন সে সচেতনভাবে তার কতটুকুই বা অনুভব করতে পারে! তা হলেও জাল মোহাম্মদের মাঝে মাঝে মনে হয়েছে, তার মধ্যে এত শক্তি ছিল, কই সে তো তার খবরই রাখত না। দুদিন আগেও সে ছিল নিতান্ত সাধারণ একজন মানুষ। কিন্তু আজ এত লোক ভরসা করে তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। এ শক্তি কোথা থেকে এল?

জাল মোহাম্মদ সেদিন এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পায়নি। এর উত্তর পেয়েছিল অনেকদিন বাদে, যখন কৃষক আন্দোলনের পথ ধরে এগিয়ে চলতে চলতে সে রাজনৈতিকভাবে সচেতন হয়ে উঠল। তখন সে বুঝতে পেয়েছিল যে, জনসাধারণের সংগ্রাম মানুষের ঘুমন্ত শক্তিকে নাড়া দিয়ে জাগিয়ে তোলে! জনসাধারণের নেতা আর কর্মীরা সেই শক্তিতেই শক্তিমান হয়ে ওঠে।

অবশেষে জাল মোহাম্মদের নেতৃত্বে শুরু হয়ে গেল কাহারোল হাটের তোলা বিরোধী আন্দোলন। এরই মধ্য দিয়ে সারা অঞ্চলের কৃষকদের মধ্যে বিপুল আলোড়ন জেগে উঠল। আন্দোলন জয়যুক্ত হতে বেশী সময় লাগল না। এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে জাল মোহাম্মদের প্রচার ও সংগঠনের শক্তির পরিচয় পাওয়া গেল।

এই সাফল্যের পর কৃষক সমিতি আর জাল মোহাম্মদের নাম দেখতে দেখতে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। নানা জায়গা থেকে কৃষকদের ডাক আসতে লাগল, জাল মোহাম্মদকে চাই। এক জাল মোহাম্মদ কত জায়গায় যাবে, এত লোকের এত দাবি কেমন করে মিটাবে! বিন্দুমাত্র অবসর নেই তার। সংসারের সঙ্গে যেটুকু সম্পর্ক ছিল, তা প্রায় চুকে বুকেই গেল। জাল মোহাম্মদ ঘর-বাড়ী, আত্ম-পরিজন সবাইকে পিছনে ফেলে রেখে কৃষক সাধারণের মাঝখানে ছড়িয়ে দিল আপনাকে। তার অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে ইউনিয়নে ইউনিয়নে কৃষক সমিতি গড়ে উঠতে লাগল। তার আদর্শ আর প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নতুন নতুন কর্মী এগিয়ে আসতে লাগল সামনে! এবার তার কর্মক্ষেত্র শুধু নিজের থানার মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে রইল না। কাহারোল, বীরগঞ্জ, খানসামা আর বোচাগঞ্জ থানা কৃষক সমিতির জয়ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠল।

কৃষক নেতা জাল মোহাম্মদের নাম সারা দিনাজপুর জেলায় ছড়িয়ে পড়ল।

দিনাজপুর জেলার বর্গা চাষীদের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম আমাদের দেশের কৃষক আন্দোলনের ইতিহাসের এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। তার প্রথম পর্যায় সুদ বন্ধের আন্দোলন। জোতদাররা বর্গাচাষীদের যে পরিমাণ ধান কর্জ দিত, ধান ওঠার সময় তার দেড়া ধান আদায় করে নিত। ফলে বর্গাচাষীদের মধ্যে বহু লোককেই জোতদারের কর্জ শোধ হবার পর খালি ডালা কুলো নিয়ে ঘরে ফিরে যেতে হত। অভাবের তাড়নায় আবার তাদের ধান কর্জ করবার জন্য জোতদারদের দ্বারস্থ হতে হত। ফলে জোতদারের ঋণ থেকে মুক্ত হবার কোন উপায় তাদের ছিল না। এই দুর্দশার প্রতিকারের জন্য কৃষক সমিতির পক্ষ থেকে এই দাবি তোলা হয়—কর্জ ধানের সুদ নাই। এই আন্দোলনই সুদ বন্ধের আন্দোলন।

এই আন্দোলন করতে গিয়ে জাল মোহাম্মদ গ্রেফতার হয়। জোতদারের জুলুম থেকে দুঃস্থ কৃষকদের রক্ষা করবার আন্দোলন চালাবার অপরাধে তাকে ৬ মাস কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়।

বর্গাচাষীদের আন্দোলনের দ্বিতীয় ও চরম পর্যায় তেভাগা সংগ্রাম। জাল মোহাম্মদ এতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। অন্যান্য বিশিষ্ট কৃষক নেতার মত আন্দোলন পরিচালনার স্বার্থে তাকে পলাতক জীবন যাপন করতে হয়। প্রকাশ্য লোকচক্ষুর আড়ালে থেকে জাল মোহাম্মদ আন্দোলন করতে থাকে। যেখানেই আন্দোলন সেখানেই জাল মোহাম্মদ। তার গতিবিধি গোয়েন্দা পুলিশদের কাছে অজানা ছিল না। তাকে ধরবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টাও করেছে তারা। কিন্তু সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। কৃষকরা তাদের এই প্রিয় নেতাকে চোখের মণির মত অতি সতর্কভাবে রক্ষা করত। আর

কোন উপায় না দেখে পুলিশ তার বাড়ীতে একটা নোটিশ টাঙিয়ে দিল যে, অমুক তারিখের মাধ্য আত্মসমর্পণ না করলে পর তার সম্পত্তি নীলাম হয়ে যাবে। ওরা আশা করেছিল জাল মোহাম্মদ সম্পত্তির মায়ায় ধরা দেবে। কিন্তু ওরা তাকে চিনতে পারেনি। নির্ধারিত সময় পার হয়ে গেল, কিন্তু জাল মোহাম্মদ আত্মসমর্পণ করল না। তাকে জব্দ করবার জন্য পুলিশ তার গোয়াল থেকে ৩০।৪০টি গরু নীলামে বিক্রি করে দিল।

এর কিছুদিন পরে তেভাগা আন্দোলনকে চূর্ণ করে দেবার জন্য পুলিশ কৃষকদের উপর ভীষণভাবে নির্যাতন চালাতে থাকে। এই দমননীতির বিরুদ্ধ প্রতিবাদ জানিয়ে দিনাজপুরের বিভিন্ন অঞ্চলে জনসভা অনুষ্ঠিত হতে থাকে। প্রকাশ্যে বক্তৃতা করবার মত বক্তা তখন খুব কমই ছিল। তাদের মধ্যে অধিকাংশ হয় জেলে নয়তো পলাতক অবস্থায় কাজ করছে। জাল মোহাম্মদ কখনও কখনও সুযোগ বুঝে এই সমস্ত সভায় দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিয়ে পরক্ষণেই অদৃশ্য হয়ে যেত। খবর পেয়ে পুলিশ তাকে তাকে ছিল। একদিন এই রকম একটা সভায় বক্তৃতা করতে গিয়ে জাল মোহাম্মদ ধরা পড়ে গেল। সরে পড়ার উপায় ছিল না। মিলিটারী আর পুলিশ সভার জায়গাটা ঘেরাও করে রেখেছিল।

জেলখানায় তখন ভীষণ ভীড়। তেভাগা আন্দোলনের ব্যাপারে ধৃত বহু বন্দী ঠাসাঠাসি গাদাগাদি হয়ে পড়ে আছে। ৭।৮ মাস হাজতবাসে কাটল। ইতিমধ্যে ১৯৪৭-এর ১৪ই আগস্ট এসে গেছে। স্বাধীনতা লাভের উপলক্ষে বন্দী সবাই মুক্ত হয়ে বাইরে চলে এল।

মাত্র বছর কয়েক আগে বৃদ্ধ জাল মোহাম্মদ তার প্রাণ থেকেও প্রিয় কৃষক ভাইদের ছেড়ে চিরতরে চলে গেছে। জীবনের শেষ

দিন পর্যন্ত কৃষক সমিতির সঙ্গে তার অন্তরের যোগাযোগ অটুট ছিল। যারা তাকে শেষ জীবনে ঘনিষ্ঠভাবে দেখেছে, তারা বলেছে, এমন জীবন্ত ও আশাবাদী মন খুবই কম দেখা যায়। আজকের এই দেশজোড়া অবসাদ ও হতাশার মধ্যেও তাকে কোনদিন হতাশায় ভেঙ্গে পড়তে দেখা যায় নি। বরঞ্চ সে সবাইকে সাহস যুগিয়েছে, আশ্বাস দিয়ে বলেছে, হবে, আবার সবই হবে। যা কিছু ভেঙ্গে পড়ছে, সব আবার নতুন করে গড়ে উঠবে। দেখো, দেখে নিও তোমরা।

ধানচোর



সন্ধ্যাবেলা আমাদের জনৈক গুপ্তদূত মারফত একটা গোপন খবর পাওয়া গেল। জমিদার ধীরেন ভট্টচার্যের লোকেরা আজই নাকি ফেরেজতুল্লাহর জমির ধান কেটে নিয়ে যাবে। ফেরেজতুল্লাহ আমাদের কৃষক সমিতির একজন কর্মী। ওরা রাত্রির অন্ধকারে এসে কাজ সেরে নিয়ে দিনের আলো দেখা দেবার আগেই অন্তর্ধান হয়ে যাবে। ওদের সঙ্গে নাকি বাছা বাছা লাঠিয়ালরা আসছে। খবরটাকে অবিশ্বাস করে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। আমাদের এই গুপ্তদূতটি এ পর্যন্ত এ ধরনের যত খবর নিয়ে এসেছে, তার একটিও মিথ্যে হয়নি।

খুলনার প্রখ্যাত কৃষক নেতা বিষ্ণু চ্যাটার্জি তাঁর অতীত দিনের কৃষক আন্দোলনের স্মৃতিকথা বলে চলছিলেন। সেই সমস্ত রোমাঞ্চকর কাহিনী মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনছিলাম। শ্রাবণের সন্ধ্যা। সেই কখন থেকে একটানা বৃষ্টি চলেছে। চায়ের পেয়ালায় শেষ চুমুক দিয়ে বললাম, জমিদাররা চিরদিনই কৃষকদের ধান হরণ করত, তা জানি। কিন্তু তাই বলে এমন চোরের মত গোপনে, রাত্রিবেলা?

হ্যাঁ, তাই। চোরের মতই। দিনের আলোয় এভাবে হামলা করবার মত দুঃসাহস ওদের ছিল না।

আমি বললাম, ব্যাপারটা একটু পরিষ্কার করে বলুন। এ ভাবে ধান চুরি করবার উদ্দেশ্যটা কি? জমিদার কি ফেরেজতুল্লাহর উপর তার মনের ঝাল মিটাতে চাইছিল বা তাকে জমি থেকে উৎখাত করবার মতলব আঁটছিল?

জমি থেকে উৎখাত করার মতলব? হ্যাঁ তাই বটে। আইন মোতাবেক সেই ব্যবস্থা আগেই সুসম্পন্ন হয়ে গিয়েছিল। জমিদার ধীরেন ভট্টচার্য ইতিপূর্বেই বাকী খাজনার দায়ে তার সমস্ত জমি নীলামে উঠিয়ে নিজের হাতে নিয়ে এসেছিলেন, কিন্তু হাতে আসার পরেও হাতের মুঠোর মধ্যে পাচ্ছিলেন না। ফেরেজতুল্লাহ তার জমির দখল ছাড়ে নি। যেন কিছুই হয়নি, এই ভাবে সে তার চাষবাসের কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল। কৃষক সমিতির সেই রকম নির্দেশই ছিল।

একটু আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করলাম, কৃষক সমিতি এমন নির্দেশ দিয়েছিল? এ ব্যাপারে আইন তো সম্পূর্ণভাবে জমিদারের পক্ষে। ফেরেজতুল্লাহ কি করে তাকে ঠেকিয়ে রাখবে?

কি করে ঠেকিয়ে রাখবে? সংঘবদ্ধ শক্তির জোরে ঠেকিয়ে রেখেছিল তারা শেষ পর্যন্ত। একা ফেরেজতুল্লাহ নয় তো, সেখানকার বহু কৃষকেরই এই সমস্যা—আরও তাদের জীবন-মরণ সমস্যা। আইন বাঁচিয়ে এই সমস্যার সমাধান সম্ভব ছিল না। এর পিছনকার ইতিহাসটা শুনলে বুঝতে পারবেন।

শৈলেন ঘোষ আর ধীরেন ভট্টাচার্য, এরা দুজন এ অঞ্চলের বড় জমিদার। শোভন ইউনিয়নের বিল অঞ্চলের জমিগুলিকে কি করে কৃষকদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে নিজেদের খাস করে

নেওয়া যায়, বহুদিন আগে থেকে তারা এই ফন্দি আঁটছিল। জমিদাররা প্রয়োজন মনে করলে ছলে বলে কৌশলে নানাভাবেই প্রজাদের জমি খাস করে নিত। কিন্তু এরা এ ব্যাপারে যে কৌশল অবলম্বন করল তা যেমন অভিনব, তেমনি অমানুষিক। আপনাকে তো আগেই বলেছি, এই বিল অঞ্চলে সমুদ্রের নোনা পানি প্রবেশ করার ফলে ধান জন্মাতে পারত না। আর ধানই হচ্ছে এই সমস্ত জমির একমাত্র ফসল। কাজেই মাঠের পর মাঠ সারা বছর খিল হয়ে পড়ে থাকত। বাঁধ তুলে নোনা পানির প্রবাহকে আটকে দিতে পারলে এই সমস্যার প্রতিকার হয়। এখানকার কৃষকরাও অনেক দিন থেকে নিজেদের উদ্যোগে বাঁধ তুলবার জন্য চেষ্টা করে আসছিল। কিন্তু জমিদারের ঘোর আপত্তি, ওখানে কোন বাঁধ বাঁধা চলবে না। এতগুলো লোকের আবেদন নিবেদন সত্ত্বেও হুজুরের মন গলল না।

কিন্তু জমিদার কি এমন হুকুম দিতে পারে?

ঠিক বলেছেন। প্রজারা নিজেদের জায়গায় নিজেদের খরচে বাঁধ তুলবে, তার বিরুদ্ধে কার কি বলবার থাকতে পারে? কিন্তু তখন জমিদাররা ছিল দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। তাদের কথাই আইন। ন্যায়ই হোক আর অন্যায়ই হোক, তাদের কথা অমান্য করবে, কার ঘাড়ে এমন দশটা মাথা?

কিন্তু জমিদারের আপত্তির কারণটাই বা কি? জমিতে যদি ফসল না ফলে তাহলে কৃষকরাই বা কেমন করে খাজনা যোগাবে?

সাধারণ বুদ্ধিতে এই কথাই মনে হবে। কিন্তু এই আপত্তির পিছনে ছিল এক বিরাট ষড়যন্ত্র। জমিদারেরা কামনা করছিল এই সমস্ত জমি এই ভাবে অজন্মা পড়ে থাক। তাহলে কৃষকরা টাকার অভাবে সময় মত খাজনা দিতে পারবে না। শেষকালে বাকী খাজনার দায়ে ওদের জমি নীলামে তুলে তাদের খাস করে

নেবে। এই ষড়যন্ত্রের ফাঁদ পেতে ওরা একের পর এক কৃষকদের জমি খাস করে নিয়ে চলছিল। সেই সংকটের মুখে কৃষক সমিতি গড়ে উঠল। সমিতি নির্দেশ দিল, কেউ জমির দখল ছাড়বে না।

এবার জমিদার আর কৃষকদের মধ্যে জমির মালিকানা দিয়ে এখানে ওখানে কিছু কিছু সংঘর্ষও হয়ে গেল। কিন্তু কৃষকরা এক-জোট হয়ে উঠবার ফলে জমিদার বিশেষ সুবিধা করে উঠতে পারছিল না। আর এই সমস্ত লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে কৃষকের সাহসও বেড়ে গিয়েছিল। তারা জমিদারের নিষেধ অমান্য করে বরাবুনিয়ায় বাঁধ গড়ে তুলল। তার ফলে অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটল। বছর দুই যেতে না যেতেই দেখা গেল যে, সেই অভিশপ্ত মাটি ফসলের সম্ভার বুকে নিয়ে সোনালী হাসি হেসে উঠেছে। সেই হাসি জমিদারের বুকে শেলের মতই বিঁধছিল।

ফেরেজতুল্লাহর জমিতে এবার চমৎকার ধান ফলেছে। এ বছরের সেরা ধান। দেখলে পরে চোখ ফেরানো যায় না। ধীরেন ভট্টাচার্যের নায়েবও বোধ হয় ফেরাতে পারছিল না।

এ কি কম আফসোসের কথা! এত বুদ্ধি খাটিয়ে এনে কৌশল করে ফেরেজতুল্লাহর জমি খাস করে নেওয়া হ'ল আর সে কিনা সেই জমিতে এমন খাসা ফসল ভোগ করবে। এ কি সয়! নায়েব এবার বোধ হয় শক্তি পরীক্ষায় নামছে। আজ যদি সে ধান লুটে নিতে পারে, তাহলে এই ধরনের হামলা ব্যাপকভাবে চলতে থাকবে। কাজেই প্রথম কিস্তিতেই তাকে ভালমত শিক্ষা দিয়ে দেওয়া দরকার, যাতে এর পরে আর এগোতে সাহস না করে।

দেরী করার সময় ছিল না। সবাইকে ডাকিয়ে এ বিষয়ে পরামর্শ করা যাবে সে সুযোগও নেই। নিজ দায়িত্বে গ্রামে গ্রামে খবর পাঠিয়ে দিলাম, যাতে সবাই তৈরী থাকে, আর বিপদ সংকেতের

শব্দ শোনামাত্রই সবাই যেন যার যার হাতিয়ার নিয়ে ফেরেজতুল্লাহর জমির দিকে ছুটে যায়। আমি যেখানে ছিলাম সেখান থেকে ফেরেজতুল্লাহর বাড়ীর দূরত্ব দু'মাইল।

এক বিষয়ে একটু ভাবনা হচ্ছিল। আমাদের এই অঞ্চলে ভাল লাঠিয়ালের দল নেই। আর ওরা নাকি জবরদস্ত লাঠিয়ালদের নিয়ে আসছে। তার উপরে দুটো একটা বন্দুকও হয়তো থাকবে। বন্দুক আমাদের নেই। তার জন্য কিছু নয়, এ সব ক্ষেত্রে বন্দুকে বন্দুকে লড়াই কম হয়। কিন্তু ওদের লাঠিয়ালরা। খালি মাঠে গোল না দিয়ে যায়। সেটা বিষম কেলেংকারীর কথা হবে। আগে জানা থাকলে খবরাখবর করে জানাশোনা কিছু কিছু লাঠিয়ালকে আনিয়ে নেওয়া যেত। কিন্তু এখন সেই শেষ মুহূর্তে তা কেমন করে সম্ভব? হঠাৎ মনে পড়ে গেল ধানীবুনিয়ার হীরালাল বাইনের দলের কথা। খুলনা জেলার যে কয়টা প্রথম শ্রেণীর লাঠিয়ালদের দল আছে, হীরালাল বাইনের দল তার মধ্যে একটি। হীরলালকে দেখার সুযোগ হয়নি কোনদিন। সে আমাদের কৃষক সমিতির লোকও নয়। সাহায্যের জন্য ডাকতে পারি, কোন দিক দিয়ে এমন সম্পর্ক নেই। তবে একটা কথা, কিছুদিন আগে আমাদের এখানকার একজন কৃষক কর্মী ধানীবুনিয়ায় গিয়েছিল তার এক আত্মীয়বাড়ীতে। আমাদের কমিটি ধানীবুনিয়ার লোকদের মধ্যে কৃষক সমিতির আলোচনা তুলেছিল। তারা নাকি খুব মন দিয়ে তার কথা শুনেছিল। আমাদের সেই কর্মীটির নাম সোনা। হঠাৎ কেমন এক খেয়ালের ঝোঁকে সোনাকে পাঠিয়ে দিলাম ধানীবুনিয়ায়।

আজ রাতে আর ঘুমিয়ে কাজ নেই। জমিদারের দল যদি আসেই, তবে তাদের সঙ্গে একবার মোলাকাত করতে হবে তো। এ কাজে ও কাজে দুপুর রাত গড়িয়ে গেল। সারা দিনের

ক্লান্তিতে দেহটা ভেঙ্গে পড়ছিল। ভাবলাম, একটু গড়িয়ে নেওয়া যাক, ঘুমিয়ে না পড়লেই হ'ল। কিন্তু রাজ্যের ঘুম শিকারীর মত আমার পাশ ঘেঁষে অপেক্ষা করছিল। নিঃশব্দে তারা তাদের মায়াজাল ছড়িয়ে দিল। ধরা পড়ে গেলাম।

তারপর কখন কে জানে একসঙ্গে কতকগুলো শিংগা আর ঢোলের শব্দে সচেতন হয়ে তড়াক করে উঠে বসলাম। এই যে, তাহলে সত্যসত্যই এসে গেছে ওরা। দু মাইল দূরের বিপদ সংকেত গ্রাম থেকে গ্রাম হয়ে এগোতে এগোতে এখানে এসে পৌঁছেছে।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম, ঘণ্টাখানেক রাত বাকী আছে। যে যেমন অবস্থায় ছিলাম সেই অবস্থাতেই কেউ লাঠি, কেউ দা, কেউ সড়কি, যার যা হাতিয়ার নিয়ে ছুটলাম। প্রথমে ৩০-৪০ জন একসঙ্গে ছিলাম। তারপর যতই এগোই, সংখ্যা ততই বেড়ে চলে। যখন অকুস্থলে এসে পৌঁছলাম, তখন আমাদের সংখ্যা কয়েক শ'তে এসে দাঁড়িয়েছে। এ রকম দল চারদিক থেকেই আসছে।

এসে যে অবস্থা দেখলাম তাতে অনুশোচনার অবধি রইল না। কেন এমন সময় এ জায়গায় না থেকে ওখানে পড়ে রইলাম। অসংগঠিত জনতা সময় বিশেষে চরম উত্তেজনার মুখে যথেষ্ট বীরত্বপূর্ণ কাজ করলেও সুসংগঠিত দলের বিরুদ্ধে তারা প্রায়ই চূড়ান্ত দুর্বলতার পরিচয় দেয়। এ ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। এখানে সংগঠিত ভলান্টিয়ার বাহিনী ছিল না, না ছিল উপযুক্ত সাহসী নেতা। এ কথাটা আগেই বিবেচনা করে দেখা উচিত ছিল। আমাদের লোকেরা ওদের চেয়ে সংখ্যায় অনেক বেশী হলেও ওদের লাঠিয়ালদের রণহুঙ্কার শুনে আর নায়েবের হাতের বন্দুক দেখে ভয়ে পিছিয়ে জড়সড় হয়ে রইল। এমন কি ঘাবড়ে গিয়ে বিপদ সংকেতটা জানাতেও দেরী করে ফেলল। আর ওরা সেই সুযোগে চটপট

ধান কেটে সাত আটটা নৌকা বোঝাই করে নিয়ে শাখাবাহী নদী দিয়ে পালিয়েছে।

ওদিকে চোরেরা তাদের কাজ হাসিল করে পালিয়ে যাচ্ছে। এদিকে চলছে হট্টগোল। একে অপরকে দুষছে। আর বাইরে থেকে যারা এসেছে, তাদের মধ্যে কেউ কেউ এ অবস্থায় কি করা উচিত ছিল সে সম্পর্কে মূল্যবান উপদেশ ঝেড়ে চলেছে। অনেকেই আমার অভিমত জানবার জন্য আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। কিন্তু আমাকে কোন কথা বলবার সুযোগ না দিয়ে সামনে এগিয়ে এল এক বুড়ো। সবাইকে উদ্দেশ করে সে কুৎসিত আর অশ্লীল ভাষায় গাল দিয়ে উঠল। তারপর বলল, কুত্তার বাচ্চারা ধান নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে ওরা আর তোরা এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি দেখছিস? ছোট্ ব্যাটারা ছোট্, ওই শালার ধানচোরদের কান ধরে টেনে নিয়ে আসতে হবে।

বুড়ো আর কোন কথা না বলে কাঁধে লাঠি নিয়ে সবার আগে ছুটল। দুদিন আগেও তাকে দেখেছি। একটু নুয়ে পড়ে পা টেনে টেনে হাঁটতে। পায়ে নাকি রস জমেছিল। কোথায় গেল রস, কোথায় কি, জোয়ানদের পিছনে ফেলে বুড়ো এগিয়ে যাচ্ছে। এরই নাম নেতৃত্ব। কি ছিল তার কথায় কে জানে। হা-হুতাশ আর পরস্পর কথা কাটাকাটি ছেড়ে দিয়ে লোকগুলো এখন উর্ধ্বশ্বাসে তার পিছনে পিছনে ছুটে চলেছে। আমিও ছুটলাম সবার সঙ্গে। শাখাবাহী নদীর কাছে আসতেই অস্পষ্ট-ভাবে নৌকাগুলোকে দেখা গেল। নৌকাগুলো আমাদের চেয়ে বেশ কিছুটা এগিয়ে গেছে, কিন্তু আমাদের দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে যেতে পারেনি এখনও।

আমরা দুভাগ হয়ে শাখাবাহী নদীর দুই তীর ধরে ছুটে

চলেছি। হাজার হাজার লোক ছুটছে, কারু মুখে কথা নেই, কোন আওয়াজ নেই, নিঃশব্দে শিকারীর মত ছুটে চলেছে। ওরাও দেখতে পেয়েছে আমাদের। তাই ওদের গতিবেগ বেড়ে গেছে। আমরা এখান থেকেও তা বুঝতে পারছি। কিন্তু যত জোরেই যাক না কেন ধরা ওদের পড়তেই হবে, এ বিষয়ে আমাদের মনে কোনই সংশয় নেই। মুখ দেখে বোঝা যায় এই একই বিশ্বাস সকলেরই মনে। মনে হচ্ছে ওদের ধরবার জন্য যদি প্রয়োজন হয় আমরা পৃথিবীর এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত যেতে প্রস্তুত আছি।

কঠিন প্রতিযোগিতা। কিন্তু একটা জিনিস পরিষ্কার, আমাদের ব্যবধান ক্রমেই কমে আসছে। ধরা ওদের পড়তেই হবে। রাতের অন্ধকার কেটে গিয়ে দিনের আলো ছড়িয়ে পড়ছে। আকাশের সব তারা ডুবে গেছে। শুধু আকাশের পশ্চিম প্রান্তে শুকতারাটা জ্বল জ্বল করে জ্বলছে। এখন আমরা স্পষ্টভাবে নৌকাগুলোকে পৃথক পৃথক ভাবে দেখতে পাচ্ছি। একটা বিরাট ভাওয়াইয়া নৌকা। তার পিছনে আরও ৭।৮ খানা নৌকা। উল্লাসে চীৎকার করে উঠলাম আমরা, এবার আর রেহাই নেই ওদের। আমাদের হাতে ধরা দিতেই হবে।

কিন্তু আর কিছু দূর এগোতেই আমরা সবাই চমকে গেলাম। সামনেই ভদ্রা নদী। এ কথাটা আমাদের মনেই ছিল না। ওদের নৌকাগুলি যদি কোনমতে ভদ্রায় গিয়ে পড়তে পারে, তাহলে আর অনুসরণ করা চলবে না, ওরা আমাদের নাগালের বাইরে চলে যাবে। অথচ এখন আমরা একেবারেই কাছে এসে পড়েছি। ওদের নৌকার মাঝিরা ভদ্রায় গিয়ে পড়বার জন্য উর্ধ্বশ্বাসে বৈঠা টেনে চলেছে। এতদূর এসে একটুকুর জন্য হেরে যাব আমরা। উত্তেজনায়, আশঙ্কায় আমাদের বুক কেঁপে উঠল।

ঠিক এমনি সময় এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। অবাক হয়ে দেখলাম ওদের নৌকাগুলো স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। ছুটতে ছুটতে আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম, এবার নতুন বল পেয়ে আরও বেগে ছুটলাম। আরও কিছুটা সামনে এগিয়ে দেখি গোটা দশেক নৌকা পাশের খাল থেকে বেরিয়ে এসে ওদের পথ আটকে দাঁড়িয়েছে। প্রতিটি নৌকায় ৪।৫ জন করে লোক। তাদের হাতে ঢাল আর সড়কি। প্রথমে কয়েক মুহূর্ত আমরা কিছুই বুঝতে পারলাম না। হঠাৎ আমাদের মধ্যে একজন চেঁচিয়ে উঠল, ওই যে সোনা হাত নেড়ে ইশারা করছে। এরা ধানীবুনিয়ার হীরালাল বাইনের দল, আমাদের সাহায্য করতে এসেছে। তাই বটে, তাই বটে, এবার আমাদের মধ্যে আনন্দের কোলাহল পড়ে গেল। জমিদারের ভাওয়াইয়া নৌকার মধ্যে কতক্ষণ পরামর্শ চলল। তারপর জমিদারের দল হার মেনে আত্মসমর্পণ করল। পরে শুনেছি, ওদের লাঠিয়ালরা ধানীবুনিয়ার লাঠিয়ালদের সঙ্গে লড়তে সাহস করেনি। ভাওয়াইয়ার ছাদের উপর স্বয়ং নায়েব মশাই বন্দুক বাগিয়ে বসেছিলেন। অবস্থা বিপর্যয় দেখে তিনি আমার দিকে তাকিয়ে আর্তকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলেন, বিষ্ণুবাবু, আমি আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই, যদি ভরসা দেন তো যেতে পারি। বললাম, ভয় করবেন না, নেমে আসুন।

আমাদের লোকেরা তেতে আগুন হয়ে ছিল। এই নায়েবের বিরুদ্ধে তাদের বহুদিনের ক্রোধ জমাট বেঁধে আছে। বহু কষ্টে শান্ত করলাম তাদের। তারা দুভাগ হয়ে পথ করে দিল। তাদের মধ্য দিয়ে নায়েব মশাই কাঁপতে কাঁপতে এগিয়ে এলেন। কাঁপবার কথাই। যাদের মধ্য দিয়ে আসছিলেন, দেখলাম তাদের চোখগুলো

একজন ভাল কর্মীকে তাদের ওখানে পাঠিয়ে দেই। তারা স্থির করেছে গ্রামসুদ্ধ সবাই কৃষক সমিতির সভ্য হবে।

একসঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বলে বিষ্ণুদা এবার থামলেন। একটা বক সিগারেট আমার হাতে এগিয়ে দিয়ে নিজেও একটা ধরালেন।

অনেকক্ষণ বাদে আমি এবার মুখ খুললাম। বললাম, হীরালাল বাইন সম্বন্ধে কৌতূহলী হয়ে উঠেছি। সে কি সত্য সত্যই কৃষক সমিতির কিছু কাজ করেছিল।

কিছু কাজ মানে? শেষকালে হীরালাল বাইন আর সব কাজ ফেলে রেখে একান্তভাবে কৃষক সমিতির আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। এই আন্দোলনই তাঁর কাছে ধ্যান জ্ঞান জপমন্ত্র হয়ে দাঁড়াল। আর তাঁর জন্য উপযুক্ত পুরস্কারও মিলেছে তাঁর। তাঁকে বুড়ো বয়সে বহুদিন রাজশাহী সেণ্ট্রাল জেলে রাজবন্দী থাকতে হয়েছে।

তাই নাকি? আশ্চর্য হয়ে বললাম।

এতেই আশ্চর্য হয়ে গেলেন! আরও একটু শুনুন। তাঁর এলাকায় তিনি আন্দোলনের নেতৃত্ব নিয়েছিলেন। সেই আন্দোলন যখন দুর্বার হয়ে উঠল, তখন পুলিশ গেল তাদের দমন করতে। ওরা তাদের সারা গ্রামটা ঘিরে ফেলে তার উপর তাদের অত্যাচারের রোলার চালিয়ে দিল। কৃষকরা নিঃশব্দে পড়ে পড়ে মার খেল না। তারাও পাল্টা আঘাত হানল। তারপরেই চলল গুলি। গুলিবর্ষণের ফলে হীরালাল বাইনের ছেলে রামকান্ত বাইন আর তার ভাই সতীশ বাইন ঘটনাস্থলে মারা যায়। ছেলের মৃত্যু-সংবাদ শুনে হীরালাল বাইন কি বলেছিলেন শুনবেন? কোন কথা না বলে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকালাম। বলেছিলেন, ওরা এক ছেলেকে মেরে ফেলেছে সে জন্য হীরালাল

বাইন দমে যাবে না। তাঁর এক ছেলে গেছে, আরও ছেলে আছে। আর আমার সব ছেলেও যদি যায়, দেশের লক্ষ লক্ষ কৃষকের ছেলেরা থাকবে। ওরা তাদের সবাইকে মেরে ফেলতে পারবে না।

বিষ্ণুদা থামলেন। আমি চুপ করে রইলাম। এক একটা অবস্থা আসে যখন মানুষ নিঃশব্দ হয়ে যায়। এও সেই রকম অবস্থা। হীরালাল বাইনের সেই কথা কটি কানের কাছে গুঞ্জন করে ফিরছে—আমার সব ছেলেও যদি যায়, দেশের লক্ষ লক্ষ কৃষকের ছেলেরা থাকবে। ওরা তাদের সবাইকে মেরে ফেলতে পারবে না।

খালিশপুরের কারবালা



একটু আগেই বেশ জোর এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গিয়েছে। কাঁচা রাস্তাটায় এখানে ওখানে জল জমে আছে। আকাশে মেঘের ভার। দিনের আলো ম্লান হয়ে এসেছে। পিছল পথ। কোনমতে পা টিপে টিপে চলতে হয়। একটা আছাড় খেতে খেতে একটুর জন্য সামলে নিয়ে আমার সঙ্গী শ্রমিক বন্ধুটিকে জিজ্ঞাসা করলাম, এ রাস্তার নাম কি? বিষম রাস্তা দেখছি!

এই তো পি আই ডি সি রোড, এসে গেছি আমরা, বন্ধুটি উত্তর দিল।

এসে গেছি! থমকে দাঁড়ালাম। এই পি আই ডি সি রোড—এই সেই খালিশপুরের কারবালা? ১৯৪৬ সালের ১৩ই আর ১৪ই অক্টোবর, পি আই ডি সি রোড তার বুকে এই দুটি দিনের রক্ত আর অশ্রুতে মাখানো স্মৃতি বহন করে আছে। ঘটনাটা যখন ঘটেছিল, তখন ছিলাম জেলে। কাগজে দেখলাম চটকল শ্রমিক ফেডারেশন আর মজদুর ফেডারেশন যুক্তভাবে ১২ই অক্টোবর তারিখে পাটকল শ্রমিকদের ধর্মঘটের জন্য ডাক দিয়েছে।

এর পরিণতি কি ঘটে তা জানবার জন্য আমরা সবাই উৎসুক হয়েছিলাম। তার কদিন বাদেই সংবাদপত্রের পাতায় খালিশপুরের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের সংবাদ পেয়ে একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম আমরা। আমাদের সহবন্দী দৌলতপুরের নজরুল ইসলাম বাইরে থাকতে এখানকার এই পাটকল শ্রমিকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিল। এই সংবাদ দেখে তার চোখে যে দৃষ্টি ফুটে উঠেছিল, তা এখনও মনে পড়ে। আর কয়েক দিন বাদেই মুক্তি পেয়ে বাইরে এলাম। বাইরে এসে ভুক্তভোগী ও প্রত্যক্ষদর্শীদের মুখে যা শুনলাম, তা থেকে মনে হল শ্রমিক আন্দোলনকে টুঁটি টিপে মেরে ফেলবার জন্য সারা প্রদেশ জুড়ে এক গভীর ষড়যন্ত্র চলেছে। তার সবচেয়ে নিষ্ঠুর আর বীভৎস রূপ ফুটে উঠেছে খালিশপুরের এই নির্মম ও নির্বিচার গণহত্যার মধ্য দিয়ে।

কোন্ কোন্ মিল বারোই অক্টোবরের ধর্মঘটে যোগ দিয়েছিল? প্রশ্ন করলাম।

বন্ধু উত্তর দিল, একমাত্র পিপল্স জুট মিলের শ্রমিকরাই ধর্মঘট করেছিল। বাকী চারটা মিলের মধ্যে একটাতেও ধর্মঘট হয়নি। শ্রমিকদের ইচ্ছা ছিল ধর্মঘটে যোগ দিতে, কিন্তু তাদের ইউনিয়নের নেতারা ঠেকিয়ে রাখলো তাদের। হাঁটতে হাঁটতে সেই সব কথাই চলছিল। বন্ধুটি সেই সব কাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করে চলছিলেন।

বারোই তারিখে পিপলস জুট মিলে পূর্ণ ধর্মঘট হয়ে গেল। মিল কর্তৃপক্ষ বহু চেষ্টা করেও ধর্মঘটে ভাঙ্গন ধরাতে পারেনি। শ্রমিকদের মধ্যে যারা মিল কর্তৃপক্ষের দালাল হিসাবে কাজ করত তারা ভাড়াটে গুণ্ডাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে নানারকম চেষ্টা করে দেখল, কিন্তু ওদের সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হল। ওদের উপর নির্দেশ

ছিল, যে কোন রকমেই হোক, ধর্মঘট ভাঙতেই হবে। কিন্তু ওরা পেরে উঠছিল না।

তেরো তারিখের সারাটা দিন ধর্মঘট চলল। ইঞ্জিনের চাকা ঘুরল না, চিমনীতে ধোঁয়া উঠল না। পিপলস জুট মিল অচল হয়ে পড়ে রইল। মিল কর্তৃপক্ষ, আর তাদের পৃষ্ঠপোষকরা তখন ভিতরে ভিতরে ষড়যন্ত্রের জাল বুনে চলেছিল, তা কারু পক্ষে কল্পনা করাও সম্ভব ছিল না। শ্রমিকরা জানত ধর্মঘট করবার পূর্ণ অধিকার তাদের আছে। সারা পৃথিবীর শ্রমিকরা দীর্ঘ দিনের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এই মৌলিক অধিকার অর্জন করেছে। কিন্তু ধনীরা চিরদিনই গরীবদের অধিকার নিয়ে ছিনিমিনি খেলে। সুযোগ পেলেই ওরা তাদের ন্যায্য অধিকারের উপর হামলা চালায়।

সারাটা দিন শান্তিপূর্ণভাবেই ধর্মঘট চলল। বিকাল বেলা হঠাৎ অবস্থার মোড় ঘুরে গেল। পিপলস জুট মিলের গেটে ইউনিয়নের যে দেড় শত ভলান্টিয়ার মোতায়েন ছিল, পুলিশ তাদের সবাইকে গ্রেফতার করে ফেলল। অবস্থা শান্তিপূর্ণ, গ্রেফতার করবার কোনই যুক্তি বা অছিলা ছিল না। এই অশান্তিকে সাধ করে ডেকে আনবার কারণ কি, সেটা বোঝা গেল পরে।

গ্রেফতারের সংবাদ বিদ্যুৎগতিতে ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। ফলে শ্রমিকদের মধ্যে দারুণ উত্তেজনা দেখা দিল। দেখতে দেখতে শত শত শ্রমিক ছুটে এল সেখানে। তারা ঘিরে ধরল পুলিশদের, বলল, আমাদের ভাইদের ফিরিয়ে দাও। লোকের ভীড় ক্রমেই বেড়ে চলল। সকলের মুখেই এই এক দাবি, ফিরিয়ে দাও আমাদের ভাইদের। এই দাবির প্রত্যুত্তরে পুলিশ চালাল গুলি। গুলিবর্ষণের ফলে জনতা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। জনকয়েক জখম হ'ল।

গুলি চালনার সংবাদ প্রচারিত হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তার প্রতিবাদে ক্রিসেণ্ট জুট মিল, প্লাটিনাম জুবিলি জুট মিল আর দৌলতপুর জুট মিল—নদীর ওপারের এই তিনটি পাটকলের শ্রমিকরা হাতের কাজ বন্ধ করে মিল ছেড়ে বেরিয়ে এল।

ভাড়াটে গুণ্ডারা আগে থেকেই তৈরী হয়ে ছিল। এবার শুরু হ'ল তাদের হামলা—।

বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন বন্ধুটি। কয়েক পা পিছনে ছিলাম, সামনে এগিয়ে গিয়ে বললাম, কি হ'ল, থেমে গেলেন যে? হাত বাড়িয়ে দেখালেন, ওই দেখুন, বেড়া দিয়ে ঘেরাও করা জায়গাটুকু।—তার কণ্ঠস্বর কেমন যেন বদলে গেছে।

কি, কি ওখানে? কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করলাম।

ওখানে আমরা আমাদের হাবিবুল্লাহ ভাইকে দাফন করেছি।

হাবিবুল্লাহ! কোন হাবিবুল্লাহ?

সে কি, হাবিবুল্লাহর নাম শোনেন নি? আমাদের পিপলস জুট মিলেরই শ্রমিক, যাকে ওরা গত জুন মাসের গোলমালের সময় বোমা ফেলে মেরে ফেলেছে।

কাঁচা বয়স। মাত্র কয়েকদিন আগে বিয়ে করে এসেছিল।

এবার মনে পড়ে গেল। একটু লজ্জিত কণ্ঠে বললাম, হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে।

তাঁর বাড়ী নোয়াখালি, তাই না?

জী। এই যে বড় মাঠটা দেখছেন, এটা আমাদের শ্রমিকদের সম্পত্তি, আমাদেরই চাঁদার টাকায় কেনা হয়েছে। আমরা আমাদের নিজেদের জমিতে আমাদের হাবিবুল্লাহ ভাইকে শুইয়ে রেখেছি। এই পথ দিয়ে হাজার হাজার শ্রমিক ভাই যাতায়াত করে। তারা যেতে

আসতে এই কবরের দিকে তাকাবে, আর মনে সাহস পাবে, শক্তি পাবে।

শহিদ হাবিবুল্লাহর কবরের দিকে তাকিয়ে আমরা দুজনে কতক্ষণ নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইলাম। কেমন যেন অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু একা হাবিবুল্লাহ ভাই-ই তো নয়, নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে বন্ধু বলে চলল, শত শত শ্রমিক বন্ধুর স্মৃতি ভেসে বেড়াচ্ছে এখানে। তাদের মৃতদেহ নিয়ে কি করেছে ওরা, তা ওরাই জানে। মুসলমানের ছেলে, কবরটুকু পর্যন্ত তাদের ভাগ্যে জুটল না। অথচ আমরা নাকি ইস্‌লামিক স্টেটের প্রতিষ্ঠা করেছি।

কয়েক পা এগিয়ে যাবার পর আমি আগেকার কথার ছিন্ন সূত্রটাকে জোড়া দিয়ে বললাম, তারপর সেই যে গুণ্ডাদের হামলার কথা বলছিলেন—।

হ্যাঁ, ওরা তৈরী হয়ে ছিল। এবার দল বেঁধে পথে বেরিয়ে এল। তাদের হাতে সড়কি, বল্লম, ছোরাছুরি, আরও কত কি! সবাই সশস্ত্র। পথের লোক আতঙ্কিত হয়ে ওদের দিকে তাকিয়ে রইল। করতে চায় কি এরা? কি করতে চায়, তার উত্তর পেতে দেরী হল না। ওরা প্রথমেই প্লাটিনাম জুবিলী মিলের শ্রমিক বস্তির মধ্যে ঢুকে বেছে বেছে কয়েকটা বাড়ীতে আগুন ধরিয়ে দিল। গোলপাতার ঘর, দেখতে দেখতে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল।

চারদিকে চ্যাচামেচি, কান্নাকাটির শোর পড়ে গেল। এ আগুন নেভানোর সাধ্য ছিল না। ওরা পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখছে। যে নেভাতে চাইবে, সে প্রাণে মরবে। সবাই প্রাণ নিয়ে পালাতে ব্যস্ত। দেখতে দেখতে বস্তি ছাই হয়ে গেল।

পুলিশ ছিল না সামনে?

ছিল বইকি। এসব ক্ষেত্রে তারা সাধারণত যা করে থাকে, তাই করছিল, অর্থাৎ চুপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তামাসা দেখছিল। গুণ্ডারা এই বস্তিটা শেষ করে পিপলস জুট মিলের দিকে অগ্রসর হল। তাদের প্রধান আক্রোশ পিপলস জুট মিলের শ্রমিকদের বিরুদ্ধে। দালালরা এখানেই সবচেয়ে বেশী ঘা খেয়েছে। বহুদিনের চেষ্টা সত্ত্বেও ওরা এখানকার শ্রমিকদের মধ্যে ফাটল ধরাতে পারেনি।

পিপলস জুট মিলের কাছে আসতেই ওরা প্রথম বাধা পেল। সেখানকার শ্রমিকদের সঙ্গে এদের একটা সংঘর্ষ হয়ে গেল। লোকে বলে শেষ পর্যন্ত পুলিশ নাকি এ বিষয়ে নিষ্ক্রিয় দর্শক হয়ে থাকতে পারেনি। শ্রমিকেরা পরপর দুবার ওদের হাটিয়ে দিয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পুলিশ যখন এসে হস্তক্ষেপ করল, তখন তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল।

গুণ্ডার দল পিপলস জুট মিলের শ্রমিকদের ইউনিয়ন অফিসের ঘরটাকে ভেঙ্গেচুরে মিশ্‌মার করে দিয়ে গেল। বলা বাহুল্য, পুলিশ এ ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করার প্রয়োজন বোধ করেনি। এখানকার কাজ সেরে ওরা গিয়ে ক্রিসেণ্ট জুট মিলে হানা দিল। কিন্তু এখানে ওরা প্রথমে সুবিধা করে উঠতে পারছিল না। ক্রিসেণ্ট জুট মিলের শ্রমিকরা ভিতর থেকে বৃষ্টিধারার মত ইঁট বর্ষণ করে চলছিল। এমন সময় শান্তিরক্ষার নাম করে পুলিশ এ ব্যাপারেও হস্তক্ষেপ করল। তারা ক্রিসেণ্ট জুট মিলের ভিতরে গিয়ে শ্রমিকদের এই বলে আশ্বাস দিল যে, তোমাদের কোন ভয় নেই, আমরা তোমাদের রক্ষা করব। তবে আপাতত তোমরা মিল ছেড়ে আর কোথাও চলে যাও। অবস্থা শান্ত হলে আবার ফিরে এসো। এই আশ্বাস পেয়ে শ্রমিকরা মিল ছেড়ে বেরিয়ে এল।

তাদের হাতে কোন হাতিয়ার ছিল না। এমন কি সামান্য লাঠিটা পর্যন্ত না। ওদিকে সশস্ত্র গুণ্ডারা বাইরে ওৎ পেতে অপেক্ষা করছিল। শ্রমিকরা গেট দিয়ে বেরিয়ে আসতেই ওরা ঝাঁপিয়ে পড়ল তাদের উপর। রক্ষকের বেশে যারা এসেছিল, বিপদের সময় তাদের পাত্তা পাওয়া গেল না। গুণ্ডাদের এই আক্রমণের ফলে বহু লোক মারা পড়ল সেখানে। পি আই ডি সি রোডের কালো মাটি তাদের রক্তে লাল হয়ে গেল। এর পর দুদিন পর্যন্ত ওই জায়গায় নাকি দশ বারোটি লাস পড়েছিল। আর ওখান থেকে কিছুটা দূরে আরও ত্রিশ বত্রিশটি লাস দেখা গিয়েছে।

গুণ্ডার দল এতেও ক্ষান্ত হল না। এরপর ক্রিসেণ্ট জুট মিলে গিয়ে ঢুকল। সে সময় সেখানে কোন শ্রমিক ছিল না। বাবুর্চি, পানি টানবার লোক প্রভৃতি যেসব লোক সেখানে ছিল, তারা ভাবতেও পারেনি যে, তাদের উপরেও হামলা হতে পারে। কিন্তু গুণ্ডারা সমস্ত অঞ্চল জুড়ে চরম বিভীষিকা সৃষ্টি করবার জন্য তৈরী হয়েই এসেছিল। মিলের মধ্যে ঢুকেই ওরা যাকে সামনে পেল, তার উপরেই অস্ত্র চালাতে শুরু করল। পালিয়ে যাওয়ার উপায় ছিল না, জল্লাদের দল পথ আটকে দাঁড়িয়ে আছে। অসহায় মানুষগুলি প্রাণ বাঁচাবার জন্য বৃথাই ছুটাছুটি করতে লাগল। এই বর্বর ও হিংস্র আক্রমণের ফলে বেশ কিছু লোক মারা গেল।

তেরোই তারিখে বিকেল থেকে শুরু করে রাত্রির মধ্যেই এত সব ঘটনা ঘটে গেল?

জী, হ্যাঁ। কিন্তু এইখানেই এর শেষ নয়। তার পরদিন চৌদ্দই অক্টোবর সারা দিন রাত একই তাণ্ডব চলল। পিপলস জুট মিল থেকে শুরু করে নিউজপ্রিণ্ট পেপার মিল পর্যন্ত বিস্তৃত

এলাকায় গুণ্ডাদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল। মানুষ নামধারী এই হিংস্র পশুর দল ওদের রক্তভৃষ্ণা মিটাবার পর এখন লুটপাটের দিকে মন দিলো। বস্তির কুঁড়ে ঘরগুলি ওরা আগেই পুড়িয়ে শেষ করেছিল। কিন্তু যেখানে টাকার গন্ধ পেয়েছে সেখানে আগুন দেয়নি, দোকানপত্র, ঘরবাড়ী ভেঙেচুরে লুটপাট করে নিয়েছে। ওই যে মাঝে মাঝে খালি জায়গাগুলো দেখছেন ওখানে সব ঘর পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছিল। এই ক'মাসে খালি জায়গাগুলোতে অনেক নতুন নতুন ঘর আর দোকান উঠেছে। আর কিছুদিন আগে এলে দেখতে পেতেন এখানকার এই বীভৎস চেহারাটা।

এই ঘটনার কদিন বাদে আপনারা এখানকার অবস্থা দেখতে এসেছিলেন?

কদিন বাদে কি বলেন! এর পর মাসখানেক পর্যন্ত কারু কি এখানে ঢোকার যো ছিল! বিশেষ করে আমাদের পক্ষে। সে সময় এখানে এলে পর হয় গুণ্ডাদের হাতে প্রাণ দিতে হত নয়তো পুলিশ গ্রেফতার করত। এই তো ছিল অবস্থা। কে আসবে?

সবসুদ্ধ কত লোক মারা গেছে এখানে?

সে সম্বন্ধে সঠিকভাবে কেউ বলতে পারবে না। কেউ বলে চার শো, কেউ বলে পাঁচ শো, নানা জনে নানা কথা বলে। লাসগুলির কি গতি হয়েছে, তাই বা কে জানে! সত্য মিথ্যা জানি না, লোকে বলাবলি করে লাসগুলি নাকি লঞ্চ বোঝাই করে সুন্দরবনের দিকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

এ কি সত্যি কথা?

আগেই তো বলেছি, এ সম্পর্কে জোর করে বলার উপায় নেই। তবে এখানকার লোকেরা এই কথাটা বিশ্বাস করে।

এমনি সময় ঝুপঝুপিয়ে বৃষ্টি নামল। কতক্ষণ থেকে বৃষ্টির আশঙ্কা করছিলাম। আমরা দুজন দৌড়ে গিয়ে এক দোকানঘরে ঢুকে পড়লাম। বন্ধু আঙুল বাড়িয়ে দেখাল, ওই যে দেখুন এখনও দু'একটা পোড়াকাঠ পড়ে আছে। ওখানেও ওরা আগুন লাগিয়েছিল।

সরলাদি



নৌকোটা খালের বাঁক ঘুরে বিলের মধ্যে এসে পড়ল। নৌকোয় দু'জন লোক। একজন রোগা-পাতলা যুবক, ফতুয়া গায়ে, মালকোঁচা এঁটে ধুতিটা হাঁটুর উপরে টেনে তুলেছে। লগি ঠেলে নৌকা বেয়ে চলেছিল সে। অপরজন একটি নববধূ। ঘোমটায় মুখ ঢেকে নৌকোর মাঝখানে জড়সড় হয়ে বসে আছে।

বাতাসে বিলের জলে মাতন লেগেছে। ঢেউয়ের তালে তালে আর বাতাসের দোলায় ধানগাছগুলি ফসলের সম্ভার বুকে নিয়ে হেলছে, দুলছে, পরস্পর কোলাকুলি করছে। দু'পাশে ধানক্ষেত, তাদের মাঝখানে আলের ফাঁক, তারই উপর দিয়ে কলকলিয়ে দুলদুলিয়ে দুপাশে ধান-কন্যাদের চুমো খেতে খেতে এগিয়ে চলেছে নৌকোটা।

বিলের উপর দিয়ে কিছুটা এগিয়ে যেতেই হঠাৎ বাতাসের জোর বেড়ে গেল? বিলের যা স্বভাব, বাতাসের একটু ছিঁটে-ফোঁটা পেলেই আদেখলে ছেলের মত মাতামাতি শুরু করে দেয়। আর বাতাসের যদি জোর বাড়ে তখন আর তাকে

পায় কে? বাতাস আর জলের মাতামাতিতে নৌকো চালানো কঠিন হয়ে উঠল। নৌকোটা বারবারই পথ ছেড়ে বিপথে চলে যাচ্ছে।

সামাল দিতে গিয়ে যুবকটি গলদঘর্ম হয়ে উঠল। মানুষ আর বাতাসের সঙ্গে লড়াই। অনেক কষ্টে কিছুটা যদি এগোয়, পরক্ষণেই বাতাসের ঝাপটায় সব কিছু টালমাটাল হয়ে যায়। 'দিশামিশা' হারিয়ে যুবকটি গলুইয়ের উপর বসে পড়ে মনের সঞ্চিত বিক্ষোভ প্রকাশ করে বলল, শ্‌শালা!

এমন সময় একটা অঘটন ঘটল। বউটি এতক্ষণ একগাদা কাপড়ের পুঁটলির মত নিঃশব্দে নৌকার মাঝখানে পড়েছিল। হঠাৎ সে উঠে দাঁড়িয়েছে। উঠে দাঁড়াতে দেখা গেল, কাপড়ের পুঁটলী বলে ভুল করার কোন কারণ নেই। দীর্ঘ, সুগঠিত দেহ, লম্বায় যুবকটির চেয়ে আঙ্গুল দুই বড়ই হবে। বয়স বেশী নয়, ষোল থেকে বিশ পর্যন্ত যে কোন বয়স হতে পারে। গায়ের রং ঘনকৃষ্ণ, সেই রংয়ের মধ্যে কোন ভেজাল নেই। মুখশ্রী সুন্দর নয়, তবে স্বাস্থ্যের দীপ্তিতে দীপ্তিমতি। এ মেয়ে সুন্দর কিনা প্রথম দর্শনে সে কথা মনেই জাগে না, তার অসাধারণত্ব সুন্দর অসুন্দরের প্রশ্নটাকে চাপা দিয়ে দেয়। আমাদের দেশের মেয়েদের মধ্যে এমন একটি চেহারা মেলা কঠিন।

উঠে দাঁড়িয়েই সতর্ক দৃষ্টিতে চারদিকে তাকিয়ে দেখে নিল সে। না; নির্জন বিল, জনমানবের চিহ্নমাত্র নেই। নববধূর প্রতি প্রযোজ্য সামাজিক বিধিনিষেধ সব কিছুই এখানে অচল। পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখল ফেলে আসা গ্রামের উঁচু তালগাছটা যেন একদৃষ্টিতে তারই দিকে চেয়ে আছে। তা থাক, বোবা তালগাছ, কোন কথা কাউকে বলতে পারবে না। ঝট করে ঘোমটা টেনে

আঁচলটা শক্ত করে জড়িয়ে নিল কোমরে। তারপর এলো চুল-গুলিকে জড় করে মাথার সামনে ঝুটি বেঁধে নিল।

কয়েক মুহূর্তের ব্যাপার। যুবকটি আশ্চর্য হয়ে তার কাণ্ডকারখানা দেখছিল। বউটি তারই। তবে নতুন বউ, পরিচয়টা এখনও ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেনি কিন্তু কি করতে চায় ও? বিস্ময়ের ধাক্কাটা কাটিয়ে কোন কথা বলবার আগেই মেয়েটি এক হ্যাঁচকা টানে স্বামীর হাত থেকে লগিটা ছিনিয়ে নিয়ে নৌকো চালাতে শুরু করে দিয়েছে। যুবকটি হাঁ হাঁ করে উঠে দাঁড়িয়ে তাকে বাধা দিতে গেল, একি, একি, তুমি মেয়েমানুষ হয়ে নৌকা বাইছ। ছাড়ো ছাড়ো, বসে পড়।

ধেত্তেরি মেয়েমানুষ! ইস এখন খুব মরদগিরি ফলানো হচ্ছে যে। নৌকা বাইব না তো কি সারাদিন এই বিলের মধ্যে বসে থাকব নাকি? বাড়ী ঘর যেতে হবে না? তুমি কোন কথা কয়ো না তো, চুপ করে বসে থাকো।

যুবকটি বসে পড়ল, কিন্তু স্বেচ্ছায় নয়। মেয়েটি তার হাত চেপে ধরে বসিয়ে দিয়েছে। ওর বজ্রমুঠির চাপে তার হাতটা নাড়বার যো ছিল না। তার অবস্থাটা হয়েছিল বাজের থাবায় বন্দী কবুতরের মত। যুবকটি নির্বোধ নয়, সে বুঝতে পারছিল এ নিয়ে শক্তি পরীক্ষা করতে যাওয়াটা কাজের কথা নয়। তাহলে পুরুষের ইজ্জত যেটুকু অবশিষ্ট আছে, তাও থাকবে না।

বাতাস তেমনি করেই বইছিল, বাতাস আর পানিতে তেমনি করেই চলছিল মাতামাতি। কিন্তু তাহলেও এবার নৌকো বিলের ওপারের একটা তালগাছের দিকে লক্ষ্য করে বাতাসের ঝাপটা কাটিয়ে সঠিক পথে এগিয়ে চলেছে। মেয়েটির সুপুষ্ট সবল হাতে লগিটা উঠছে পড়ছে, দেখেই বোঝা যায় এ-কাজে অত্যন্ত পটু সে।

যুবকটি তার এই দক্ষ হাতের চালনা দেখে লজ্জা, প্রশংসা আর নিরুদ্ধ ক্ষোভের মিশ্র অনুভূতি নিয়ে হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে আছে। এই তার বউ। এরই সঙ্গে সারাটা জীবন একসঙ্গে কাটিয়ে দিতে হবে। শেষ পর্যন্ত বনিবনা করে চলতে পারবে তো দু'জনে? ডানপিটে মেয়েটার হাতের জোরে ওদের নৌকো বিল পেরিয়ে একটা গ্রামের কাছে এসে পৌঁছল। গ্রামের আভাস পেতেই হাতের লগিটা স্বামীর হাতে তুলে দিয়ে সে আবার যথাস্থানে পুঁটলির মত বসে রইল।

মেয়েটির নাম সরলাবালা পাল, আর তার স্বামীর নাম রামচন্দ্র পাল; এরা নমশূদ্র চাষী। যশোর জিলায় নড়াইল মহকুমার গুয়াখোলা গ্রামে এদের বাড়ী। এই সরলাবালা পালই আমাদের ভবিষ্যতের সরলাদি, কৃষক আন্দোলনের নেত্রী হিসাবে যার নাম যশোর জেলায় সুপরিচিত। তাঁর নিষ্ঠা, সাহস আর বীরত্বের কাহিনী শুধু যশোর নয় যশোরের সীমা ছাড়িয়ে অন্যান্য জেলায় কৃষক কর্মীদের কাছেও গিয়ে পৌঁছেছিল। সরলাদির বাড়ী গুয়াখোলা। তার পাশের গ্রাম বাকড়ি। গ্রাম বাংলার পথে পথে ঘুরতে ঘুরতে সেই বাকড়িতে গিয়ে উঠেছিলাম। স্বাধীনতা লাভের কয়েক বছর আগে বাকড়ি কৃষক আন্দোলনের অন্যতম পীঠস্থান হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ১৯৪৬ সালে বাকড়ি, দোগাছি, কমলাপুর, ঘোড়ানাছ, হাতিয়ারা, গুয়াখোলা, বেনাহাটি প্রভৃতি পরস্পর সংলগ্ন গ্রামগুলিতে যে ব্যাপক তেভাগা আন্দোলন শুরু হয়েছিল, বাকড়ি ছিল তাদের কেন্দ্রস্থল।

সরলাদির প্রসঙ্গ উঠলে এখানকার লোকদের, কি পুরুষ কি মেয়ে, কারু মুখ থামতে চায় না। শুনলাম সরলাদির সঙ্গে গায়ের জোরে এঁটে উঠতে পারে, এমন পুরুষ এই তল্লাটে কেউ নাকি ছিল না। একথা এখানকার পুরুষরা নিজেরাই স্বীকার করত। এখনও করে।

ঘর গেরস্থালির মেয়েলী কাজে মন বসত না সরলাদির। যেটুকু নেহাৎ না করলে নয়, শুধু সেইটুকু কোনমতে সেরে নিয়েই সরলাদি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়তেন। কোথায় যেতেন, তার কোন ঠিক ঠিকানা ছিল না। যখন যেদিকে মন যেত, সেদিকে চলে যেতেন। গ্রামের এ বাড়ী ও বাড়ী তো আছেই, তা ছাড়া এখানকার পাঁচ সাতটা গ্রামে তিনি সব সময় টহল দিয়ে বেড়াতেন। লোকে বলত তাঁর পায়ের তলায় সরষে। এক দণ্ড স্থির থাকতে পারেন না। তাঁর নিজের অভ্যাসমত যখন হাঁটতেন, তখন কেউ তাঁর সঙ্গে হেঁটে কুলিয়ে উঠতে পারত না। লম্বা লম্বা পা ফেলে চোখের পলক ফেলতে কোথা থেকে কোথায় চলে যেতেন। সরলাদির সব কিছুই বিচিত্র। শ্বশুর-শাশুড়ী নেই, বলার মত কেউ ছিল না। স্বামী তো মহাদেব, সাতেও নেই পাঁচেও নেই।

আত্মীয়-স্বজন, গ্রামের পাঁচজন প্রথম প্রথম এই নিয়ে নানারকম কথা তুলত। কিন্তু শেষে দেখে দেখে তারাও অভ্যস্ত হয়ে উঠল। ক্রমে ক্রমে এই কথাটা সবাই মেনে নিল যে সরলাদির কথা স্বতন্ত্র। এ আলাদা জাতের মেয়ে। আর দশটা মেয়েকে যে ভাবে সামলে রাখতে হয়, এর বেলায় সে সব কথা ওঠে না। এ মেয়ে নিজেকে নিজেই বাঁচাতে জানে। পাপ এর কাছে ভয়ে ঘেঁষতেই পারে না। তাই সরলাদির চালচলন যতই খাপছাড়া হোক না কেন এ নিয়ে কেউ কোন বাধা দিত না। আর বাধা দিলেই বা মানে কে! এ আগুনকে কি আর চেপে রাখা যায়!

তাছাড়া সময়ে অসময়ে সকলেরই কাজে লাগে। লোকের অসুখে বিসুখে, বিপদে আপদে সরলাদি বুক পেতে দাঁড়াতেন, সেখানে আপন পর বোধ বিবেচনা ছিল না। তার অসাধ্য বলে কোন কিছু ছিল না তো। রোগীর জন্য ডাবের দরকার, গাছে ডাব

আছে, কিন্তু গাছে ওঠবার মত কেউ নেই, ডাকো সরলাদিকে। তাকে আর দুবার বলতে হবে না, কথাটা মুখ থেকে পড়তেই পায়ে দড়ি জড়িয়ে সড় সড় করে উঠে যাবেন নারকেল গাছের আগায়। হঠাৎ করে অসময়ে কোন অতিথি এল কারু বাড়ীতে। ঘরে কোন আয়োজনপত্র নেই, কি দিয়ে ভদ্রতা রক্ষা করা যাবে! সরলাদি যদি কাছাকাছি থাকেন, কোন ভয় নেই, খবর পেলেই নেমে যাবেন পুকুরের মধ্যে, তারপর ডুবে ডুবে খালি হাতেই গোটা কয়েক মাছ ধরে এনে তখনকার মত ইজ্জত বাঁচিয়ে দেবেন।

সরলাদি সম্পর্কে কত গল্পই যে ছড়িয়ে আছে। একদিন সরলাদি পথ দিয়ে যেতে যেতে দেখলেন একদল লোক একটা বড় নৌকোকে ডাঙ্গায় টেনে তুলবার জন্য চেষ্টা করছে। এত লোকের টানাটানিতেও নড়ছে না নৌকোটা। সরলাদি এই দৃশ্য কতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলেন। শেষে আর চুপ করে থাকতে পারলেন না। কেউ তাকে সাহায্য করবার জন্য ডাকেনি। এসব কাজে কোন মেয়েকে ডাকবার কথাও নয়। কিন্তু সরলাদি কারু ডাকার জন্য অপেক্ষা না করে নিজেই এগিয়ে এসে তাদের সঙ্গে হাত লাগালেন। ব্যাস, সুপুত্রের মত সুড় সুড় করে উঠে এল নৌকো। সবাই ধন্য ধন্য রব তুলল। একদিন দেখা গেল সরলাদি একটা তালের ডোঙ্গা কাঁখে নিয়ে মন্দ মন্দ গতিতে বাড়ীর দিকে চলেছেন। এমন দৃশ্য কেউ কোনদিন দেখেনি। দেখতে দেখতে লোকের ভীড় জমে গেল। তার এই সমস্ত কীর্তিকলাপ দেখে গ্রামের লোকে তার নাম দিয়েছিল সরলা সিং। কার মাথা থেকে এটা প্রথম বেরিয়েছিল, সেকথা কারু জানা নেই। কিন্তু দশজনের দেওয়া এই নামটা খুব চালু হয়ে গেল। শেষকালে লোকের মুখে মুখে সরলা পাল সরলা সিং নামেই পরিচিত হয়ে উঠেছিলেন।

বয়স যখন পঞ্চাশ ছুঁই ছুঁই করছে, এমন সময় সরলাদির জীবনে এক নতুন অধ্যায়ের শুরু হয়ে গেল। পরিবর্তন যে শুধু সরলাদির জীবনেই এল তা নয়, কিছুদিন থেকে বাকড়ি আর তার চারদিককার গ্রামগুলির কৃষকদের জীবনে এক নতুন আলোড়ন জেগে উঠছিল।

সারা বাংলাদেশে তখন কৃষক আন্দোলনের জোয়ার চলছে। তারই একটা ফুলকি কত কত জায়গা ডিঙিয়ে ঠিকরে এসে পড়ল এই বাকড়িতে। বাকড়ি হাইস্কুলের তখন শৈশব অবস্থা। পাশের গ্রাম বাসুন্দিয়া থেকে একজন নতুন শিক্ষক এই স্কুলে এলেন শিক্ষকতা করতে। কাঁচা বয়স, সবেমাত্র কলেজ থেকে বি. এ. পাশ করে বেরিয়েছেন। নাম অমল সেন। নরম সরম চেহারা, মিষ্টি মিষ্টি কথা, দুদণ্ডে লোকের ভালবাসা কেড়ে নিতে পারেন, এমনি তাঁর স্বভাব। তিনি গল্প লিখতেন, কবিতা লিখতেন, গান গাইতেন, নাটক করতেন, বাগান করতেন—কি না করতেন তিনি? একটা মানুষকে এতগুলো গুণ ঢেলে দেওয়া, এ বড় অবিচার, বন্ধু-বান্ধবেরা বিধাতার উদ্দেশ্যে এই অভিযোগ প্রায়ই জানাত। কিন্তু তার মনের ভিতরে যে আগুন জ্বলছিল, বাইরে থেকে তা বুঝবার যো ছিল না।

সেই আগুনের ছোঁয়া পেয়ে প্রথমে বাকড়ি, তারপর অন্যান্য গ্রামের কৃষকেরা নড়েচড়ে উঠল। বহুদিনের জমাট বরফ এবার গলতে শুরু করল। শেষে মরা নদীতে বান জাগল। গড়ে উঠল কৃষক সমিতি। কৃষকদের দাবি নিয়ে সভা, মিছিল ও সমাবেশ সমস্ত অঞ্চলকে মুখর ও চঞ্চল করে তুলল। কৃষকদের আন্দোলন পর্যায়ের পর পর্যায় অতিক্রম করতে করতে ১৯৪৬ সালে সারা প্রদেশব্যাপী তেভাগা আন্দোলনের সঙ্গে সামিল হয়ে গেল।

এই আন্দোলন শুধু পুরুষদের মধ্যে নয়, মেয়েদের মধ্যে সাড়া জাগিয়ে তুলেছিল। ইতিমধ্যে সরলাদি কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছেন। একা সরলাদি নন, মেয়েদের মধ্যে এগিয়ে এসেছেন, বাকলির অনিমা, বাকড়ির মহারাণী, ফুলমতী, বগলা, এলেন আরও অনেকে। কৃষকদের ঘরে ঘরে মেয়েদের মাধ্য সাজ সাজ রব পড়ে গেল। সরলাদি আর অনিমার নেতৃত্বে কৃষক সমিতির পাশাপাশি গড়ে উঠল মহিলা সমিতি। অনিমা লেখাপড়া জানা মেয়ে, বলতেও পারেন, লিখতেও পারেন। কিন্তু তা হলেও সরলাদিই ছিলেন এই সমিতির প্রধান প্রাণশক্তি। তিনিই মেয়েদের ঘর থেকে টেনে টেনে বার করে নিয়ে আসতেন। কৃষক ঘরের মেয়েরা আঁতুড়ঘর থেকে রান্নাঘর এই ছিল যাদের জীবন-যাত্রার পরিধি, তারা দলে দলে মহিলা সমিতিতে যোগ দিতে লাগল। এই মহিলা সমিতি কৃষক সমিতির মতই জঙ্গী সমিতি। এই সমিতি তাদের বাঁচার দাবি আদায় করবার জন্য তাদের বাপ, স্বামী, ভাই আর ছেলেদের পাশাপাশি দাঁড়িয়ে সংগ্রাম করেছিল—মার খেয়েছিল, মার দিয়েছিল, আর সর্বশেষ পর্যায়ে অত্যাচার ও লাঞ্ছনার বিষপাত্র পান করেছিল। দেখে এলাম, ওখানকার কৃষকরা যারা সেদিনের সেই সংগ্রাম প্রত্যক্ষ করেছে, তারা আজও তাদের সেই সব বীরাঙ্গনাদের কথা স্মরণ করে গৌরব বোধ করে। আর তাদের সেই সংগ্রামের নেত্রী সরলাদির কথা বলতে বলতে তারা উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে।

এ অঞ্চলে তেভাগা লড়াই যখন শুরু হয়, তখন আউশ ধান আর পাট কাটার সময়। বর্ষাকাল। সংগঠিত বর্গাচাষীরা তেভাগার জয়ধ্বনি দিয়ে ফসল কেটে যার যার ঘরে নিয়ে এল। প্রত্যুত্তরে জোতদাররা নিজেদের ভাগ না নিয়ে অসংখ্য মামলা ঠুকে

দিল তাদের নামে। ওদের উস্‌কানিতে পুলিশ এল হামলা করতে। নারীবাহিনীর প্রত্যেকে ঝাঁটা হাতে নিয়ে তাদের অভ্যর্থনা করতে গিয়েছিল। এই বাহিনীতে আড়াইশো থেকে তিনশো মেয়ে ছিল। মেয়েরা নাকি পুলিশের নৌকোটাকে টেনে ডাঙ্গার উপরে নিয়ে এসেছিল। পুলিশ অবস্থা বেগতিক দেখে মাপ চেয়ে বলল, এবারকার মত আমাদের ছেড়ে দিন, আমরা আর কোনদিন আসব না। সেদিন অল্পেই ছেড়ে দেওয়া হল তাদের। এর পর পুলিশ তাদের শক্তি বৃদ্ধি করে পর পর আরও দুবার এসে হামলা করল। সরলাদির নারীবাহিনী দুবারই তাদের হটিয়ে দিল।

এর পর মেয়েদের পিছনে রেখে পুরুষরা এগিয়ে এল সামনে। বিপদসংকেত শোনা মাত্র কৃষক সমিতির শত শত ভলান্টিয়ার তাদের ঢাল সড়কি নিয়ে আত্মরক্ষার জন্য প্রতিরোধ করে দাঁড়াল। পুলিশ ওদের ব্যূহ ভেদ করতে না পেরে ব্যর্থ হয়ে ফিরে চলে গেল। এমনি করে সকালে-বিকালে সময়ে-অসময়ে এই আক্রমণ আর প্রতিরোধের পালা আরও কয়েক 'বার চলল। মেয়েরা পিছন থেকে হাতে হাতে তাদের সাহায্য যুগিয়ে চলছিল।

সে সময়কার ছোট্ট একটি ঘটনা, কিন্তু তবু মনে রাখার মত। একদিন মহিলা সমিতির বিশিষ্ট কর্মী মহারাণী কি একটা কাজে বাইরে গেছেন। এমন সময় ঢং ঢং করে বিপদসংকেত বেজে উঠল। তার মানে ওরা আক্রমণ করতে আসছে। মহারাণী শুনতে পেয়েই ছুটতে ছুটতে বাড়ী এসে হাজির। এসে দেখেন বাড়ীতে আর কোন পুরুষ নেই, একমাত্র তার ছেলে ঠাকুর বসে বসে কি করছে। ঠাকুর, তার বয়স তখন কতই বা। এই একটি মাত্র ছেলে ছাড়া মহারাণীর আর কেউ নেই। ছেলেকে বসে থাকতে দেখে মহারাণী যেন জ্বলে উঠলেন।

এ কিরে, নিশ্চিন্ত মনে বসে আছিস যে বড়। শুনতে পাচ্ছিস না সংকেতের শব্দ! ওরা যে আসছে। ওঠ্ ওঠ্।

ঠাকুর হয় শুনতে পায় নি, নয়তো শুনেও তেমন গা লাগাচ্ছিল না। যেমন বসে ছিল, তেমনি বসে রইল! কিন্তু বসে থাকার উপায় ছিল না। মহারাণী নিজের হাতে ঢাল-সড়কি নিয়ে ছেলের হাতে গুঁজে দিয়ে বললেন, হ্যাঁরে এখনও বসে আছিস, কেমন ছেলে তুই। ওরা যে এসে গেল।

মার কাছে তাড়া খেয়ে ঠাকুর ঢাল-সড়কি নিয়ে ছুটল।

দেশের জন্য দশের জন্য কর্তব্যের ডাকে একমাত্র ছেলেকে মৃত্যুর মুখে পাঠিয়ে দিচ্ছেন মা।

এমন মা আমাদের ঘরে ঘরে কবে আসবে।

সরলাদির হাতে গড়া নারীবাহিনীর এই সমস্ত কাহিনী শুনতে শুনতে আমার নিজেরই কেমন ভুল হয়ে যেত, মনে হত যেন অন্য কোন দেশের মেয়েদের কথা শুনছি। না তা নয়, এরা আমাদেরই মেয়ে, আমাদেরই মা-বোন, যদিও আমরা তাদের খোঁজ-খবর রাখি না।

আন্দোলন মাত্র পাঁচ সাতটি গ্রামের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল বলে এই প্রতিরোধ বেশী দিন টিঁকে থাকতে পারল না। পুলিশ ক্যাম্প বসল গ্রামে। তারপর? তারপর যা ঘটল, সেই নৃশংস ও ভয়াবহ কাহিনী আর বলতে চাই না।

সাড়া নেই, শব্দ নেই, গ্রামগুলো খাঁ খাঁ করছে। সব দেখে শুনে ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলো ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে বোবা হয়ে আছে, যেন কাঁদতেও ভয় পাচ্ছে। পুলিশের তাড়া খেয়ে পুরুষদের মধ্যে অনেকেই ঘরবাড়ী ছেড়ে এ গ্রামে সে গ্রামে, মাঠে ঘাটে, বনে জঙ্গলে দিন গুজরান করছে। জোতদারদের যে ক'ঘর দালাল ছিল,

তারাই এখন গ্রামের হর্তাকর্তা হয়ে বসেছে। পুলিশকে নিয়ে ওরা এগ্রামে ওগ্রামে ঘোরে আর কোনটা কার বাড়ী তা পুলিশকে দেখিয়ে দেয়। বিশেষ করে যাদের উপর তাদের ব্যক্তিগত আক্রোশ ছিল, এই সুযোগে তা ভাল করেই মিটিয়ে নিচ্ছে। পুলিশ রক্তশোঁকা শিকারী কুকুরের মত কৃষক কর্মীদের খুঁজে খুঁজে ফিরছে। মহিলা সমিতির কয়েকজন বাছা বাছা কর্মীকেও ওরা ধরবার জন্য চেষ্টায় আছে।

সেই সময়কার দুরবস্থার কথা ভুক্তভোগীদের মুখে শুনলাম। একজন কৃষক মহিলা, তখন তিনি ছিলেন নতুন বউ, তাঁর সেই পলাতক অবস্থার কথা বর্ণনা করছিলেন :

সে সব দিনের কথা আর বলবেন না। কোলে এক বছরের কচি মেয়ে। গ্রাম থেকে গ্রামে পালিয়ে পালিয়ে ফিরছিলাম। পুলিশের অত্যাচারের ফলে মানুষের মনে তখন এমন আতঙ্ক যে, মেয়েদের আশ্রয় দিতেও সাহস পায় না। পিছনে পিছনে পুলিশের লোক আর তাদের দালালরা তাড়া করে ফিরছে। কিসের নাওয়া, কিসের খাওয়া, কত রাত জঙ্গলে বসে কাটাতে হয়েছে। বাপের বাড়ীতে গেলাম আশ্রয়ের আশায়, কিন্তু সেখানেও তিষ্ঠোতে পারলাম না। গ্রামের শয়তান লোকগুলো লাগলো পিছনে। তারা নানা কথা বলে বাপ ভাইয়ের মন খারাপ করে দিতে লাগল। শেষকালে তাদের মুখ কালো করতে দেখে ঘেন্না ধরে গেল। চলে এলাম বাপের বাড়ী ছেড়ে। আবার ফিরে এলাম নিজেদের এলাকায়। একটা রাতের কথা শুনুন। উঃ, সে কি দুর্যোগের রাত। ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি পড়ছে। ঘুটঘুটি রাত, পথ দেখা যায় না, তারই মধ্যে দিয়ে আমরা তিনটি মেয়ে এক বুক জল পার হয়ে চলেছি একটু আশ্রয়ের আশায়। কোলের মেয়েদের উঁচু করে

তুলে ধরে চলছি। যে গ্রামে পুলিশের ক্যাম্প, সেই গ্রামের উপর দিয়েই আমরা যাচ্ছি। যেতে যেতে হঠাৎ পা ফসকে গিয়ে পড়ে গেলাম। ফলে মেয়েটি আমার হাত থেকে এদিকে ছিটকে পড়ল। ডুকরে কেঁদে উঠলাম। ওদের মধ্যে একজন আমার মুখ চেপে ধরে বলল, চুপ, চুপ সর্বনাশী। ওরা টের পেয়ে যাবে যে। সবাই মিলে খুঁজতে লাগলাম মেয়েটাকে। আমার ভাগ্য ভাল, একজনের পায়ে ঠেকে গেল। কিন্তু তুলে দেখি সাড়া শব্দ নেই, কান্নাটুকুও না। মরে গেল নাকি! অন্ধকারে বোঝার উপায় নেই। ভয় পেয়ে ওর বুকের উপর কানটা চেপে ধরলাম। নাঃ মরেনি, বুকের মধ্যে একটু ধুকধুক শব্দ শুনতে পেলাম। সাহস ফিরে এল মনে। আমি উদ্বিগ্নকণ্ঠে প্রশ্ন করলাম, তারপর, তারপর? বেঁচে উঠল তো?

বেঁচে উঠল বইকি? তিনি হেসে উত্তর দিলেন, ওই দেখুন না, আপনার পেছনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প শুনছে।

সরলাদি কিন্তু মাঝে মাঝেই রাতের অন্ধকারে ওদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে গুয়াখোলায় চলে আসতেন। শুধু গুয়াখোলায় নয়, যে সব গ্রামে পুলিশের উৎপীড়ন চলছে, বিপদের ঝুঁকি ঘাড়ে নিয়েও সেখানে আসতেন। আসতেন সেখানে কি সব ঘটছে তা জানবার জন্য। এই দুর্দিনে তাদের সান্ত্বনা আর বল ভরসা যোগাবার জন্য, আর সম্ভব হলে সাহায্য করবার জন্য। কিন্তু কি সাহায্য করবেন তাদের, নিজেদেরই যে দাঁড়াবার ঠাঁই নেই!

তার এই গোপন যাতায়াতের খবর দালালদের মারফত পুলিশের কানে পৌঁছে গেল। কিন্তু ওরা তাকে হাতে নাতে ধরতে পারছিল না। ধরবার জন্য ওরা তাকে তাকে ফিরছিল। অবশেষে একদিন দিনের বেলায় ওরা তার দেখা পেয়ে গেল। তখন বেলা

দুপুর। সরলাদি তার নিজের বাড়ীতেই ছিলেন। ক্যাম্পের পুলিশ দালালদের কাছে খবর পেয়ে সরলাদির বাড়ীতে এসে হানা দিল। ওরা কোনরকম হাঁকডাক না করে সোজা বাড়ীর মধ্যে এসে ঢুকে পড়ল। ঢুকে পড়বার ঠিক আগ মুহূর্তে সরলাদি টের পেয়ে গিয়েছিলেন। তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে একছুটে তরতর করে গিয়ে পুকুর ঘাটে নামলেন। বর্ষাকাল, চারদিকে জল। এর মধ্যে একটা মেয়েমানুষ কোথায় পালাবে! পুলিশ নিশ্চিত ছিল, এবার তাকে হাতের মুঠোর মধ্যে পাওয়া গেছে।

বর্ষার প্লাবনে পুকুর আর বিল একাকার হয়ে গিয়েছে। পুকুরটা কচুরী দিয়ে ঠাসা। কোথাও কোন ফাঁক নেই, শুধু ঘাটের সামনে স্নান করবার জন্য হাত কয়েক জায়গা পরিষ্কার করে নেওয়া হয়েছে। পুলিশ সরলাদির পিছন পিছন ঘাটে এসে নামল। কিন্তু এসে দেখল সরলাদি নেই। নেই, নেই, কোথাও নেই। তবে দেখা গেল ঘাটের কাছে জলটা ঘুলিয়ে ঘুলিয়ে উঠছে। এ থেকে পরিষ্কার বোঝা গেল, সরলাদি সেখানে নেমে ডুব দিয়েছেন। কিন্তু ডুব দিলেই বা কি, এই কচুরীর ভিতর দিয়ে পালাবে কোথায়? ধরা তাকে পড়তেই হবে। ওরা লোক লাগিয়ে দিল। তারা লগি দিয়ে ঠেলে ঠেলে সরলাদির খোঁজ করতে লাগল।

ইতিমধ্যে সরলাদি এক ডুবে সেই কচুরীর তলা দিয়ে পুকুরের সীমা পেরিয়ে বিলের মধ্যে গিয়ে উঠছেন। এটা যে কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব, পুলিশ সে কথা ধারণা করতে পারেনি। ওদিকে সরলাদি মাথা তুলে একটা দম নিয়ে আবার ডুব। একজন প্রতি-বেশী সরলাদির বাড়ীতে পুলিশের হামলার খবর জানতে পেরে নৌকা নিয়ে সেই বিলের পথে বেরিয়েছিল। সরলাদি নৌকাটাকে লক্ষ্য করে এগোচ্ছিলেন। লোকটি তাকে দেখতে পেয়ে তাড়াতাড়ি

নৌকাটা চালিয়ে নিয়ে এসে সরলাদিকে আড়াল করে ফেলল। সরলাদি এবার টুপ করে নৌকার উপর উঠে পড়ে নৌকার তলায় লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লেন। তারপর নৌকা যেদিকে চলেছিল, স্বাভাবিক গতিতে সেই দিক দিয়ে চলে গেল।

এদিকে পুলিশের নির্দেশে তাদের অনুচর আর দালালরা সরলাদির তল্লাশে সারা পুকুরটাকে ঘেঁটেঘুটে কাদা কাদা করে ফেলেছে। এই উপলক্ষে পুকুরটার কচুরী প্রায় সাফ হয়ে গেছে। ঘণ্টা কয়েক ধরে লগি দিয়ে অনেক খোঁচাখুঁচি করবার পরেও সরলাদিকে জীবিত বা মৃত কোন অবস্থাতেই পাওয়া গেল না। শেষকালে ওরা হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিয়ে খালি হাতেই ঘরে ফিরল। যাবার সময় বলতে বলতে গেল, এ বেটি নিশ্চয়ই যাদু জানে, তা না হলে এতগুলো লোকের সামনে এমন করে মিলিয়ে যেতে পারে কখনও?

ক্রমে একের পর এক অনেকেই ধরা পড়ে যেতে লাগল। ওদের সবার নামেই মামলা ছিল। মহকুমা জেলখানা এদের নিয়ে ভর্তি হয়ে উঠল। ইতিমধ্যে ১৯৪৭-এর আগস্ট এসে গেছে। স্বাধীনতা লাভ উপলক্ষে বিচারাধীন বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হল।

এল স্বাধীনতা। কোটি কোটি মানুষের এতদিনের স্বপ্ন দেখা স্বাধীনতা। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক, এই আওয়াজ এতদিনে সার্থক হয়েছে! সরলাদি নিরক্ষর হলে কি হবে, রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে কিছু কিছু রাজনৈতিক জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হয়েছে, দেশ স্বাধীন হয়েছে, সারা প্রদেশের কৃষকদের দাবি যে এবার পূর্ণ হবে সে বিষয় তার মনে কোনই সন্দেহ ছিল না।

কিন্তু কিছুদিন বাদেই তার এই ভুল ভেঙ্গে গেল। স্বাধীনতার স্বরূপটা এবার একটু একটু করে তার চোখের সামনে ফুটে উঠতে

লাগল। স্বাধীন সরকার বিদেশী বৃটিশ সরকারের চেয়েও চণ্ড মূর্তি ধারণ করছিল। কৃষক সমিতির উপর পুলিশের হামলা দিন দিনই বেড়ে চলল। ফলে তার প্রতিক্রিয়া হিসাবে সারা প্রদেশের নানা জায়গায় পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ ঘটতে লাগল। এখানে দু'একটি ঘটনা ঘটে। এই উপলক্ষে এই অঞ্চলের কয়েকজন কৃষককর্মী গ্রেফতার হন। বিচারে তাঁদের দীর্ঘমেয়াদী কারাদণ্ডের আদেশ হয়। ইতিমধ্যে এখানকার সকলের নয়নের মণি, সরলাদির বড় আদরের 'ভাইডি', কৃষকনেতা অমল সেন গ্রেফতার হয়ে গেছেন। তাঁকে গ্রেফতারের সঙ্গে সঙ্গেই রাজবন্দী করা হয়েছে।

এই সমস্ত ঘটনার পর হতাশা ও অবসাদে সারাটা অঞ্চল ছেয়ে গেল। বছরের পর বছর কেটে যাচ্ছে, অবস্থা যেন ক্রমশই খারাপ হয়ে চলছে। আন্দোলনের চিহ্নমাত্র নেই। জ্বলন্ত অঙ্গারগুলো পুড়ে পুড়ে ছাই হয়ে আসছে। হাওয়া দিয়ে তাদের উসকে তোলা যাচ্ছে না। এ সব কথা শুনলে লোকে ভয় পায়, বলে, চুপ চুপ, এখন ওসব নয়। যখন উপযুক্ত সময় আসবে, তখন দেখা যাবে। কিন্তু কখন আসবে উপযুক্ত. সময়? যে সময় বিনা কাজে হারিয়ে যাচ্ছে সে সময় কি আর ফিরে আসবে কোনদিন?

সরলাদির শুধু গায়ের জোরই ছিল না, মনের জোরও ছিল। বহু কঠিন সংকটের সম্মুখীন হতে হয়েছে তাঁকে, বহু দুঃখ কষ্টের মধ্য দিয়ে চলতে হয়েছে, কোন দিন ভেঙ্গে পড়েন নি। কিন্তু এ কেমন এক পরিস্থিতি যখন লড়াই করবার পথ খুঁজে পাওয়া যায় না! এমন কেউ নেই যে, তাকে পথ দেখায়? এই সংকটের সময় "ভাইডি" যদি কাছে থাকত! কিন্তু সে তো

রাজশাহী সেণ্ট্রাল জেলে পচে মরছে, সে কি আর ফিরে আসবে কোনদিন? তার মনে পড়ে যায়, ঘণ্টার পর ঘণ্টা জেগে "ভাইডি"র কাছে কত কথাই না শুনেছেন। "ভাইডি" বলেছিল, আমরা এমন দিন নিয়ে আসব যে দিন সমাজে ধনী আর গরীব এই দুটো ভাগ থাকবে না। সবাই সমান হবে, সবাই সুখে থাকবে। কি সুন্দর করেই না বলতে পারে "ভাইডি"! আর কি ভালই না লাগে সেসব কথা শুনতে। কিন্তু "ভাইডি" যদি ফিরে এসে জিজ্ঞাসা করে, কি করেছ তোমরা এতকাল? এ প্রশ্নের কি উত্তর দেবেন তিনি? নাই, নাই, উত্তর দেবার মত কোন কথাই যে নাই।

এমনি করে বছরের পর বছর কেটে যায়। সরলাদির অমন সুস্থ সবল শরীর দ্রুতগতিতে ভেঙ্গে যেতে থাকে। মনের অবস্থাও খুব খারাপ। দৃষ্টি কেমন যেন উন্মনা। মাঝে মাঝে নিজের মনে বিড়বিড় করে কি যেন বকেন। একদিন সবাই অবাক হয়ে দেখল, শ্মশানের ধারে সেই যে এক সাধু আস্তানা গেড়ে বসেছে, সরলাদি তার সামনে চুপ করে বসে আছেন। কি পেয়েছেন তিনি সেখানে তিনিই জানেন। সেই থেকে রোজ এই একই ব্যাপার চলল। সময় মত খাওয়া সেই, বসে আছেন, বসেই আছেন। ব্যাপার কি দেখবার জন্য গ্রামের লোকেরা এসে ভীড় করল। কিন্তু তিনি কারু দিকে তাকান না, যেমন আছেন তেমনি বসে আছেন। খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে কোন উদ্বেগ নেই, পেলে খান, না পেলে খান না।

ছোট্ট সংসার সরলাদির। স্বামী অনেক দিন আগেই মারা গেছেন। তাঁর নিজের একটি মেয়ে হয়েছিল। সে শৈশবেই মারা গেছে। স্বামীর আগের পক্ষের একটি ছেলে আছে, তার নাম ভীম। সরলাদি নিজের ছেলের মতই লালন পালন করে

তাকে বড় করে তুলেছিলেন। ভীমও তাঁকে নিজের মায়ের মতই দেখে এসেছে।

শরীরের উপর এরকম অত্যাচার করতে করতে একেবারে কঙ্কালসার হয়ে গেলেন সরলাদি। তাঁকে আর সেই সরলাদি বলে চেনার উপায় ছিল না। অবশেষে যখন উঠে দাঁড়াবার শক্তি লোপ পেয়ে গেল, তখন তিনি শয্যা নিলেন। মারা যাবার ক'দিন আগে রোগটা ধরা পড়ল—রাজব্যাধি যক্ষ্মা। চিকিৎসা যা হ'ল, না হবারই মত। আর চিকিৎসার সময়ও ছিল না। রাক্ষুসী অনেক দিন আগে থেকেই তার ভিতরটা কুরে কুরে খেয়ে চলেছিল।

পুরানো দিনের কর্মী বন্ধুরা সবাই দেখতে আসত। মারা যাওয়ার আগের দিনও ক'জন এসেছিল। সরলাদি রসিক ঘোষকে উদ্দেশ করে বলেছিলেন, বেয়াই, আমি তো চললাম। কিন্তু যাওয়ার আগে অনেকের সঙ্গেই দেখা হ'ল না। অনিমা, করুণা, ওরা রইল ওপারে, আর "ভাইডি" সেও তো ফিরে এল না।

একটু সময় থেমে আবার বললেন, বেয়াই, একটা কথা বলে যাই। আমরা যে গরীবের রাজত্ব আনতে চেয়েছিলাম, আমি তা দেখে যেতে পারলাম না। তোমরাও হয়তো পারবে না। কিন্তু আমরা দেখি আর নাই দেখি, সেদিন একদিন আসবেই। মরবার আগে এ কথাটা আমার আরও বেশী করে মনে হচ্ছে। বেয়াই তোমরা বিশ্বাস ছেড়োনা। "ভাইডি" আমার মিছে কথা বলে নি।